সত্য সেলুকস !

বেদুইন

যোগমায়া প্রকাশনী
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ মহালয়া ॥ ১৯৫৮

প্রকাশক ॥
যোগমায়া প্রকাশনী
শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ ॥
সরকারী আবাসন ॥
ব্লক-সি ॥ ফ্ল্যাট : ৩
৪১, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কলকাতা : ৭০০০১১

মুদ্রণ :
সত্যরঞ্জন জানা
মাদার প্রিণ্টার্স
৩৮এইচ/১৮/১ মাণিকতলা মেন রোড
কলকাতা—৭০০০৫৪

কল্যাণীয়া সুমিলিতা ভট্টাচার্যকে

॥ এক ॥

ইতিহাসের গবেষক নির্ঝরশীতল সমাদ্দার এবং তস্য পত্নী সাবলীলা রায়-সমাদ্দার বেরসিকের মত আমার ঘুম ভাঙ্গাবে তা ভাবতেও পারিনি। মাঝরাতে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়েছিলাম। নিঃসঙ্গ জীবনে কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বর বেশ রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল, এই রোমাঞ্চের আবেশে এলিয়ে দিয়েছিলাম দেহটাকে। ভোরের মিঠে বাতাসে ঘুমটা আরও গাঢ় হয়েছিল নিশ্চয়ই এমন সময় দরজায় ধাক্কা মোটেই রুচিকর না হলেও বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম সমাদ্দার দম্পতিকে দেখে।

চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ সকাল বেলায় দেব ও দেবীর সমাহার এবং দীনগৃহে আগমন?

ভীষণ বিপদ। উত্তর দিল নির্ঝরশীতল।

বড়ই বিপন্ন! বলল সাবলীলা রায়সমাদ্দার।

বিপদ ও বিপন্নের ব্যাখ্যা করার আগে সবাইয়ের সঙ্গে এই দম্পতির পরিচয় করে দেওয়া উচিত।

নির্ঝরশীতল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অধ্যাপনা করে কোন কলেজে। সস্ত্রীক থাকে আমার পাশের ফ্ল্যাটে। উঠতে নামতে মাঝে মাঝে দেখাও হয়। পরিচয় তত ঘনিষ্ঠ নয়।

সাবলীলাও কৃতী ছাত্রী। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। মহিলা জাগরণের নেতৃত্ব করে। তার পিতা বেচারাম রায় আদালতের কেরাণী ছিলেন। অবসর প্রাপ্ত এবং জীবিত। সাবলীলা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে, সেজন্য স্বামীর পদবীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব না করে পিতার পদবী নামের সঙ্গে জুড়ে নারী প্রগতির আদর্শ স্থাপন করেছে। কেউ প্রশ্ন করলে বলে, আমি কি ওর একার সম্পত্তি।

বিবাহিত জীবনের সাত বৎসরের মধ্যে কোন সন্তান হয়নি। পরিবার কল্যাণেই বোধহয় বিশ্বাসী। কেহ-ই বন্ধ্য অথবা বন্ধ্যা নয় এটা জোর দিয়ে বলা কঠিন।

সকালবেলায় উভয়েই বেরিয়ে যায় কাজে।

ক্যান্টিনে অথবা কোন হোটেলে দিনের খাওয়া শেষ করে। রাতের বেলায় কোন মার্সীরূপী হোটেলওয়ালীর ম্যাটাডোরে ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ারে রাতের খাবার আসে। তাতেই তাদের পরিতৃপ্তি। বাড়িতে রান্নার কোন হাঙ্গামা নেই বললেই হয়। সকালবেলায় ইলেকট্রিক স্টোভে চা করা ভিন্ন আর কোন সাংসারিক কাজ নেই বলেই শোনা যায়। সাবলীলা ঘর গুছিয়ে স্নান করে বেরিয়ে পড়ে, তার পেছনে পেছন নির্ঝরশীতলও বেরিয়ে পড়ে। নির্বিবাদী জীবন। অবসর কাটে বই কেতাবের রাজ্যে। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হলে সহজে খোলে না।

আমার যতদূর জানা আছে তাতে 'বিপদ অথবা বিপন্ন' নামক শব্দ দুটির কোন স্থান তাদের জীবনধর্মে আছে বলে মনে হয়না। তবে নির্ঝরশীতলের পিতৃদেবকে একবার দেখেছিলাম। পিতাপুত্রের কিছু মনোমালিন্যও নাকি ঘটেছিল। অনেকেই বলে থাকে বৃদ্ধ পিতাকে অধ্যাপক মহাশয় এত বেশি আদর আপ্যায়ন করেছিল যে কারণে পিতৃদেব পুত্রের মুখদর্শন করবে না স্থির করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। শুনেছি নির্ঝরশীতল তাঁর একমাত্র পুত্র নয়, আরও দুটি পুত্র আছে। তাদের আশ্রয়ে কোন রকমে মাথা গুঁজে বাস করছেন।

আরও শোনা যায় ঘটনাটা ঘটেছিল সাবলীলাকে 'বউমা' সম্বোধন করায়। পুত্রবধূ তার নারীত্বের অবমাননা মনে করে এমন কিছু বলেছিল যার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল পুত্র নির্ঝরশীতলের বাচনভঙ্গীতে। বিশেষ প্রতিবাদ না করে পিতৃদেব অন্য পুত্রের আশ্রয়ে গিয়েছিলেন।

এসব অপরের পারিবারিক কথা। অপরের কথায় নাসিকা প্রবেশ করানো রুচিবিরুদ্ধ ও আইন বিরুদ্ধ সেজন্য নির্ঝরশীতল দম্পতিকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা শোনা যায়নি।

তবে কি যে ঘটেছিল তা সঠিক জানার কোন উপায় ছিলনা, জানার আগ্রহও কারও ছিলনা। কলকাতা শহরে পাশের বাড়ির খবরই বা কজন রাখে! যাইহোক, স্বামী-স্ত্রীতে কোন বাদবিসম্বাদ কখনও হয়নি বলেই আমরা জানি। তবে মাঝে মাঝে কোন কিছু নিয়ে তর্কাতর্কি যে না হয় এমন নয়। সংবাদ নিয়ে অনেকেই জেনেছে ওটা নিছক পাঠ্যবিষয় নিয়ে। দুজনে একই আলোচ্য বিষয়ে দ্বিমত হলে যা কিছু কথা কাটাকাটি। অনেকেই বলে, সবক্ষেত্রেই নির্ঝরশীতলকে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে এবং সাবলীলা তার মতামত সাবলীল গতিতে

প্রচার ও প্রয়োগ করে থাকে।

যাইহোক এহেন নির্ঝর দম্পতি আমার যখন ঘুম ভাঙ্গিয়েছে তখন তাদের সমস্যা খুবই জটিল। একজন বলছে বিপদ, অপরজন বলছে বিপন্ন। ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মত তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নীচের চেয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, বসুন।

দুজনেই চেয়ার টেনে বসল।

দুজনেরই গম্ভীর মুখ। অথচ উদ্বিগ্ন।

বললাম, আপনারা বসুন। আমি হাতমুখটা ধুয়ে একটু চায়ের জোগাড় করি।

সাবলীলা বলল, মন্দ নয়।

নির্ঝরশীতল বলল, চায়ের প্রয়োজন নেই।

বাথরুমে প্রবেশ করার পর দুজনের বাক্যালাপ কিছু কিছু শোনা যাচ্ছিল। বুঝলাম গবেষণা বিশারদ নির্ঝরশীতল তার গবেষণার বিষয়ে সাবলীলার সঙ্গে দ্বিমত হয়েছে। বোধহয় বিপদ এইখানেই।

হাত মুখ ধুয়ে নেমে গেলাম নীচের তলায়। সামনেই বাদল মিস্তিরির চায়ের দোকান। কয়েক কাপ চা ও টায়ের ব্যবস্থা করে এসে বসলাম তাদের সামনে। ওরাও ভাল হয়ে বসল।

এবার বলুন কোথায় বিপদ আর কেন বিপন্ন। তবে অগ্রিম বলে রাখছি, আমি তো পুলিশ নই, কার্যকরী কোন সাহায্য দান আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সাবলীলা বাধা দিয়ে বলল, পুলিশ-হাকিমের ব্যাপার নয়। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মানে আইন! দেখুন অবলীলা দেবী।

অবলীলা নয়, সাবলীলা। দেবী নয়, রায় সমাদ্দার।

ক্ষমা করবেন, অতটা খেয়াল ছিলনা। বলছিলাম আইনের কথা। আইন আর পুলিশকে বড ভয় হয়।

নির্ঝরশীতল বলল, কেন? কেন?

অভিজ্ঞতা। আমার এক আত্মীয়ের গৃহে ডাকাতি হল।

গল্পের গন্ধ পেয়ে সাবলীলা বলল, তারপর?

তারপর যা হয়ে থাকে। প্রচুর অর্থ সম্পদ নিয়ে এবং গৃহস্থ কয়েকজনকে প্রহার করে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন। ডাকাতরা চলে যাবার পর আমার সেই

আত্মীয় গেলেন থানায়। ব্যস্।

ব্যস্ মানে ?

পাক্কা তিন ঘণ্টা থানার দরজায় বসে রইলেন। বড়বাবু নেই, মেজবাবু নেই, অন্যবাবুরা বসিয়ে রাখলেন পাক্কা তিন ঘণ্টা। হাতে কাগজ আর কলম দিয়ে বাবুরা বলল, লিখুন এজাহার। সুবোধ বালকের মত সব ঘটনা বিবৃত করে এজাহার লিখে দিলেন।

তারপর ?

তারপর বাবুরা বললেন, থানার খরচা খরচটা দিন। ভদ্রলোক বললেন, মানে ?—মানে, এখুনি এই দুপুর রোদে বের হতে হবে। কে যাবে মশায় এই খট্‌খটে রোদে। ধরুন দুটো সেপাই আর একটা বাবু, তাদের তিয়াস লাগলে কম করেও তো তিনটে ডাব দরকার। বিকেলে তিন কাপ চা আর রুটি ডিম সিদ্ধ। এসব তো সরকার দেবেনা। মাস কাবারি মাইনে দিয়েই খালাস। আমরাও তো মানুষ।

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, তাতো বটেই।

দশটাকার একটা নোট বের করতেই থানার বাবু বললেন, মাত্র দশ। বেশ। আপনি বাড়ি যান। সেপাই দারোগা নিশ্চয়ই যাবে। দশটাকার মতই ব্যবস্থা হবে।

সাবলীলা বলল, ডাকাত ধরা পড়েছিল ?

ডাকাত! ধরা পড়েছিল! আশ্চর্য প্রশ্ন করছেন মিসেস রায় সমাদ্দার। থানার খাতায় ডাকাতির উল্লেখও করেনি থানার বাবুরা। লিখেছেন, চুরির মামলা। দশ টাকায় এর বেশি তো হয় না।

পুলিশ গিয়েছিল ?

তিন দিন পরে। গড়াতে গড়াতে প্রভুরা গিয়ে কয়েক কাপ চা পান করে ফিরে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কাউকে চিনতে পেরেছিলেন কি ?

আজ্ঞে না।

তা হলে তো মুস্কিল। ডাকাতকে চিনতে না পারলে ধরা যায় কখনও!

কাহিনী শেষ করার আগেই বাদল মিস্তিরির অনুচর পশুপতি খাঁড়া ওরফে খাঁড়ু চা ইত্যাদি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল, বাধা পডল পুলিশ কাহিনীতে।

সাবলীলা সাধারণ মহিলা নয়। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, তারপর ?

তারপর আর কি? ডাকাতি হলে থানাদারের বেইজ্জত। তাই চুরির

মামলা। ইজ্জত রক্ষা। ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবেনা। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যদি হামলা করে তবেই ডাকাতি, তার কম হলে তাকে ডাকাতি বলেনা। রাহাজানি অথবা অন্যকিছু। আইন। এই হল আইন। পুলিশ আর আইনকে বড়ই ভয়। এবার বলুন। আপনাদের কি বিপদ।

নির্ঝরশীতল বলল, বিপদ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে?

বললাম, কোন শ্রীকৃষ্ণ? ওপারের কেষ্টা মুদি। ব্যাটা পাকা চোর। ওজনে কম তো দেয়ই, জিনিস দেয় খারাপ, দাম নেয় বেশি। আমাদের ভোম্বলবাবুকে বলে তাকে শায়েস্তা করে দেব। ওসব চিন্তা করবেন না। তিন দিনে টিট করে দেব।

সাবলীল বাধা দিয়ে বলল, আহা কেষ্ট মুদি নয়। আমাদের গবেষণার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। তাকে নিয়েই বিপদ। শ্রীকৃষ্ণ মানে সেই মহাভারতের আর গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ।

যেমন?

বলতে থাকেন নির্ঝরশীতল সমাদ্দার :

শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন মথুরায়। কংসের কারাগারে। এটা তো জানেন?

বললাম, শুনেছি। শোনা আর জানা তো এক কথা নয়।

তবুও শুনেছেন। ভগ্নী দেবকীর সন্তানদের হত্যা করাই ছিল কংসের মহৎ কর্ম। কংস দৈববাণী শুনেছিল, দেবকীর পুত্র তাকে হত্যা করবে। এই কারণেই ভগ্নী দেবকী ও ভগ্নীপতি বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।

বললাম, এসবও শুনেছি।

সাবলীলা বলল, কি নিষ্ঠুর কাণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অষ্টম গর্ভের সন্তান। অর্থাৎ কম পক্ষেও ষোল বৎসর বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আটক রাখতে হয়েছিল।

বললাম, এই রকমই মনে হয়।

নির্ঝর বলল, সত্যিই তাই।

সাবলীলা বলল, তাই বলছিলাম, কংস ছিল অতি নিষ্ঠুর।

তা যদি ঘটেই থাকে তা হলে কংসকে নিষ্ঠুর বলতেই হবে।

উৎসাহিতভাবে সাবলীলা বলল, শুনলে তো সমাদ্দার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরই বসুদেব তাকে নিয়ে গোপনে মথুরার কারাগার থেকে পৌঁছে দিলেন

দ্বারকায় নন্দালয়ে।

অসম্ভব বলে চিৎকার করে উঠলেন নির্ঝরশীতল। বলল, মথুরা থেকে দ্বারকার দূরত্ব হল হাজার কিলোমিটার। একরাতে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা অসম্ভব। সেকালে তো বোয়িং বিমান ছিলনা, থাকলেও রাতারাতি এতবড় কাজটা করা সম্ভব নয়। বাইরের সাহায্য বিনা কারাগার থেকে বের হওয়া যেমন অচিন্তনীয় কাজ তেমনি তার দ্বারকা পৌছানও অসম্ভব।

সাবলীলা বলল, শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে কে বলল? গোকুলে ভেমো গয়লা নন্দঘোষের বাড়িতে পৌছে দিয়েছিল। গোকুল তো মথুরার পাশেই।

তা বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি করে রাজা হলেন দ্বারকায় সেটাই তো ভেবে দেখতে হবে। তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে হাজির করলে গোকুলে। শতশত গোপিনী নিয়ে লীলা খেলা করলেন, অথচ তার রাজ্য দ্বারকায় নিয়ে গেলেন না গোপিনীদের। শ্রীকৃষ্ণ বিয়ে করলেন রুক্মিণীকে, জাম্ববতীকে আরও বহু হতভাগিনীকে। তাদের মধ্যে রাধার নাম তো তোমাদের মহাভারতে লেখে নি।

সাবলীলা বলল, গোকুলে তার কৈশোর কেটেছে। সে সময় তার সঙ্গিনী ছিল শ্রীরাধা।

কিন্তু গোয়ালাদের সম্পর্কে রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের মামীমা, মামা আয়ান ঘোষের স্ত্রী। এ কেমন লীলাখেলা বলতে পার। মামীর সঙ্গে লীলাখেলা, ছ্যাঃ!

দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, বুঝলাম বিপদ কোথায়, আর বিপন্ন কে। আপনি বলছেন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা বাস্তব সত্য, তেমনি সত্য দ্বারকার রাজত্ব। আর উনি বলছেন সবটাই কল্পনা আর অবিশ্বাস্য। এই তো?

সাবলীলা বলল, ঠিক ধরেছেন। বলুন তো শ্রীকৃষ্ণ কি কল্পনা?

কিছুটা। আজ যে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা কাগজে কলমে পাচ্ছি তার স্রষ্টা হলেন দশম-একাদশ শতাব্দীর কবিকুল। জয়দেবঠাকুর কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম দিয়ে যে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন সেটাই বোধহয় রাধা-কৃষ্ণের বাস্তব স্থিতির কাল্পনিক ভিত্তি। এই গীতগোবিন্দ তৎকালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত প্রেম-ভক্তির সঙ্গে মানব চরিত্রের যে শাশ্বত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটাই মনে হয় রাধা কৃষ্ণের কাহিনীর ভিত্তি। আবার গীতায় দেখুন, যোদ্ধা অর্জুনকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহিত করেছেন। সেখানে তিনি আর রাধাপ্রেমী কৃষ্ণ নন।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দুই ভাবে একই যুগে দেখার পর মনে হয় সবটাই অবাস্তব। তৎকালের মুনিঋষিরা সমাজ রক্ষার জন্য যে সব নীতিবাক্য শেখাতে চেয়েছিলেন তা প্রচার করেছেন ধর্মের মাধ্যমে। কি হল মিসেস রায়সমাদ্দার? শুনতে ভাল লাগল না? তা বটে। কি সত্য তা আজও আমরা জানি না, তাই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাই, এই তো।

আমাদের সমস্যা অতি গভীরে, বলল সাবলীলা রায়সমাদ্দার। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে বলল, নিন।

বললাম, মাপ করবেন। আপনি বরং বুদ্ধির গোড়ায় ধুঁয়ো দিয়ে নিন। ততক্ষণ নির্ঝরশীতলবাবুর কাছ থেকে আপনাদের গভীর সমস্যার কথাটা ভাল করে শুনে নিচ্ছি। বলুন মিস্টার সমাদ্দার।

সাবলীলা রায়সমাদ্দার সিগারেটে আগুন না দিয়ে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমার কথা হচ্ছে, বলেই ঢোক গিলে নির্ঝরশীতলবাবু সাবলীলার দিকে একবার তাকালো এবং বলল, তা হলে বলি?

সাবলীলা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, বল। তোমার যুক্তিটাও বল, আমারটাও বলতে পার।

তবে শুনুন। আমার থিসিস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ভিত্তিক। আমার গবেষণার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ হলেও আমি কিন্তু আমার অঙ্কের হিসাব মেলাতে পারছিনা। যেমন ধরুন, কৃষ্ণ জন্মালো কোথায়, বড় হল কোথায়, রাধাকৃষ্ণের লীলাখেলা হল কোথায়, আবার অর্জুনের সঙ্গে কি করে সৌখ্য হল, অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে বেণু পরিত্যাগ করে সুদর্শনচক্র ধারণ করল কি ভাবে, এই সব ভাবতে ভাবতে স্থির করলাম, কৃষ্ণ একজন নয়, কৃষ্ণ বহুজন না হলেও কমপক্ষে দুজন কৃষ্ণ ছিলেন দ্বাপরে। নামের মিল থাকায় পত্রকাররা গুণাবলী ও দোষাবলী একপাত্রে আহরণ করে বসুদেব নন্দনের স্কন্ধে অর্পণ করে অপার আনন্দলাভ করেছে।

সাবলীলা রায়সমাদ্দার এতটা আশা করেনি। তার বক্তব্য নির্ঝরশীতল এইভাবে খণ্ডন করবে এটা ছিল তার কল্পনাতীত। উত্তেজিত ভাবে বলল, মিথ্যা কথা।

বললাম, কি মিথ্যা?

দুটো কৃষ্ণ। দেবদেবীর অপার লীলাকে অত ছোট করে দেখা উচিত নয়।

সে যুগে দেবীমায়াতে সব কিছুই সম্ভব হয়েছে, এবং শ্রীভগবান কৃষ্ণ যখন আবার আবির্ভূত হবেন ধর্ম স্থাপন করতে এবং দুষ্কৃতিকারীদের নিধন করতে তখনও দেবীমায়াতে সব কিছুই সম্ভব হবে।

নির্ঝরশীতলের কণ্ঠে আর শীতলতা ছিলনা। রূঢ়ভাবে বলল, কচু হবে।

ক্ষিপ্তের মত সাবলীলা বলল, সাট্ আপ্।

বললাম, আহা রাগ করছেন কেন? আপনাদের দ্বন্দ্ব হচ্ছে, এক অথবা দুই। আমি বলছি দুটোই সত্য।

মানে? বলে নির্ঝরশীতল আমার দিকে কটমট করে তাকাল।

দেখুন এক কৃষ্ণ গুণের আরেক কৃষ্ণ দোষের। যেটা আপনাদের যুক্তি গ্রাহ্য সেটাই ঠিক। মনে করুন, সেটা ছিল দ্বাপর যুগ। তার আগে ছিল ত্রেতা, তার আগে ছিল সত্যযুগ। এই সব যুগের নামের সঙ্গে যুগধর্ম জড়িয়ে আছে। সত্যযুগে ছিল সবই সত্য, সদাচার, সত্যবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা এইসব কত কিছু। তারপর আরম্ভ হল অবক্ষয়। সমাজ ব্যবস্থায় দেখা দিল অনাচার, অপরাধ প্রবণতা। এ থেকে সমাজকে ত্রাণ করতে এল ত্রেতা যুগের মানুষ।

সাবলীলা বলল, ত্রেতাযুগে সমাজে অবক্ষয় হয়েছিল এমন তথ্য কোথায় পেলেন?

নামে। বললাম, সে যুগে ত্রাণ করার প্রশ্ন ছিল বলেই সেটা হল ত্রেতাযুগ। তারপর দুই যুগের পর এল দ্বাপর। দ্বি-অপর যুগ। দুইয়ের পরের যুগ। এই দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ। জন্মমাত্র অবক্ষয়িত সমাজের ধাক্কায় মথুরা থেকে গোকুল. অঙ্কের হিসাবে প্রায় দশ মাইল দূরে। যশোমতীর কোলে বড় হলেন কৃষ্ণ। তারপর সবই কাহিনী। সে কাহিনীতে রয়েছে পাপপুণ্যের লড়াই। অর্থাৎ দ্বাপর আর সত্যের মাঝে যে সময় সেই সময়টা হল অবক্ষয়ের যুগ।

নির্ঝরশীতল হঠাৎ উদাসীন ভাবে বলল, আমাদের এসব সমস্যা নয়।

বললাম, সবই স্থির হবে সব কিছুর দার্শনিক ব্যাখ্যা করলে। একদল দার্শনিক বললেন, ভগবান আছেন ও চিরকাল থাকবেন। অপরদল বললেন, ভগবান নামে কেউ নেই, কোনকালে ছিলও না। তখন মধ্যপন্থীরা এলেন। বললেন, ভগবান আছেন এরও যেমন প্রমাণ নেই, আবার ভগবান নেই এরও কোন প্রমাণ নেই। তার চেয়ে যে বিশ্বাস করে তাকে বিশ্বাস করতে দাও। আবার যারা অবিশ্বাস করে তাদের অবিশ্বাস করতে দাও। এ নিয়ে লড়াই করে লাভ নেই। আপনারাও মধ্যপন্থা গ্রহণ করুন।

সাবলীলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, ওঠ শীতল। এঁর কাজ নয় আমাদের 'বিপদ ও বিপন্ন' থেকে উদ্ধার করা।

বললাম, ঠিক বলেছেন। এসব ধর্মের কচকচি থেকে আমি অনেকটা দূরে থাকি। না থেকে তো উপায় নেই। লড়াই তো চাইনা। তবে শ্রীকৃষ্ণের যাঁর প্রয়োজন তিনি তাঁকে নিয়ে সুখে থাকুন, আর যিনি গবেষক তিনি যুগ যুগ ধরে অঙ্কের হিসাব মেলাতে মেলাতে লয় প্রাপ্ত হোন। ওতে কোন 'বিপদ ও বিপন্ন' শব্দের আগমন ঘটবে না।

সবলীলা বলল, আপনি ভগবান নিয়েই ঠাট্টা করছেন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসাই ভুল।

আপনার শংসা শিরোধার্য। আপনি বরং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে পড়াশোনা করুন। উনি কৃষ্ণকে নানাভাবে আবিস্কারের চেষ্ট করেছেন। অবশ্য তৎকালে ডক্টরেট দেবার মত রেওয়াজ ছিলনা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্য সম্রাট হয়েছিলেন, এর বেশি আশাও করেননি। আপনাদের গবেষণার বিষয়বস্তু বিশেষভাবে জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ডক্টরেটটা কুক্ষিগত হওয়া অসম্ভব নয়।

নির্ঝরশীতল মুচকি হাসল। সাবলীলা বিজ্ঞের মত বলল, তুমিও এই ভদ্রলোকের দলে। বেশ আমি চললাম। তোমরা যখন ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে থাকো, তখন আর কথা নয়।

বললাম, রাগ করবেন না। কোন একজন স্মরণীয় ব্যক্তি বলেছিলেন, ভগবান কার প্রয়োজন ? উত্তর হল, মূর্খের ও দুরাচারীর। আমরা যতটা মূর্খ ততটা দুরাচারী নই। সেজন্য আমাদের ভগবানের প্রয়োজন আছে। কালোবাজারী, স্মাগলার, মদ্যপ ও অসদাচারীর যতটা ভগবানের প্রয়োজন ততটা প্রয়োজন আমাদের নেই। আর আমরা কেউ কি নিজেকে মূর্খ মনে করি। বিশেষ করে মেয়েরা তো মোটেই নিজেকে বোকা মনে করে না। এ ক্ষেত্রে ভগবান নিয়ে ঠাট্টাতামাসা কেউ যদি করে তাহলে তাদের নিজগুণে ক্ষমা করতে হয়।

আপনি দেখছি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমর্থক।

কারণ আমি বলেছি কোন মেয়েই নিজেকে বোকা মনে করেন ? কিন্তু মিসেস রায়সমাদ্দার, নারীর সহচর যেমন পুরুষ, তেমনি পুরুষের সহচরী নারী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয়েই সমান অংশীদার। এই সত্যটা আমি অস্বীকার করছি না। আমি বলছি স্বামী-স্ত্রীর জীবন ধর্মে সব নারী-ই পুরুষ অপেক্ষা

বুদ্ধিমতী এটাই মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমরা এটা স্বীকার না করেও বলতে পারি বৈষয়িক বুদ্ধিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে কিন্তু তারা যে বোকা নয় এটা প্রমাণ করতে এমন সব কাজ করে যাতে তাদের মূর্খতাই প্রমাণিত হয়ে থাকে। একটা গল্প বলে এই বিষয়ের সমাপ্তি করলেই ভাল হয়। ধর্মতলার মোড়ে কমলালয় ষ্টোর্স নামে একটা দোকান ছিল। বলা বাহুল্য বাঙ্গালীর ব্যবসা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। এটাও স্থায়ী হয়নি।

একদিন কলকাতা হাইকোর্টের কোন একজন জজসাহেব সস্ত্রীক গিয়েছিলেন কিছু সওদা করতে। জজসাহেব যে জিনিস-ই পছন্দ করেন তা অপছন্দ করেন তাঁর স্ত্রী। অবশেষে স্ত্রী যখন বললেন, তুমি কিছুই বোঝনা। তোমার মত বোকা মানুষকে নিয়ে সওদা করতে আসাই ভুল হয়েছে। জজসাহেব সত্যিই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে।

এখন বুঝুন, হাইকোর্টের জজসাহেবও কিছুই বোঝেন না সাংসারিক বিষয়ে তুলনামূলক ভাবে তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধির কাছে। এখন আপনারা স্থির করুন, কে বোকা আর কে নয়। আপনাকে যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে বলতে চাই, গোলাকার পৃথিবীতে সবই গোলমেলে। এখানে দুটি সত্তাকে আমরা স্বীকার করি। প্রথমটি হল জন্ম অপরটি হল মৃত্যু। মাঝের সময়টা হল শুধু সংঘাত, স্বার্থের সংঘাত, ক্ষমতার সংঘাত, লালসার সংঘাত। এই সংঘাতকে যে যত এড়িয়ে চলতে পারে সে ততই ভাগ্যবান।

লাবলীলা রায়সমাদ্দার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল শীতল। বের হবার সময় হয়ে আসছে। নির্ঝরশীতল অতি অনুগত জনের মত উঠে দাঁড়াল।

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাদের বিপদ আর বিপন্ন সমাধান করার মত ক্ষমতা আমার নেই। অনর্থক কতগুলো অপ্রিয় আলোচনা করলাম। মূল বিষয়ের কাছেও ঘেঁষতে পারলাম না। আমার অক্ষমতা ও অশালীনতার জন্য ক্ষমা করবেন। আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে যে যাই বলুক, আমি তার যোগ্য নই।

মুখভার করে দুজনেই বেরিয়ে গেলেন।

আমি তাকিয়ে রইলাম। ওরা চলে গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার নিদ্রার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

না শান্তি নেই।

আবার ঠক্ ঠক্।

আবার কেউ এল নাকি!

উঠতে হল। দরজা খুলতেই সাক্ষাৎ যমদূতের মত দাঁড়িয়ে পাড়ার বেশ কয়েকজন যুবক।

অবাক হয়ে তাদের বললাম, কি ব্যাপার?

আমাদের চিনতে পেরেছেন কি স্যার। এই পাড়ার ছেলে। এই হল বুবু, আমি হলাম লালটু, এ হল সমীর, ওটা তপন আর মিছা। আরও কজন আসছে।

কিন্তু কেন?

মিটিং। একটা মিটিং করব। আপনাকে যেতে হবে। পিসিডেন হবেন আপনি।

বললাম, কিসের মিটিং তা জানিনা। না জেনে পিসিডেন হওয়া কি উচিত। তোমরাই বল।

বলছি স্যার। সব বলব। না বলে কি আপনাকে নিয়ে যাব। পরশু বেলা চারটেয়। রেডি থাকবেন স্যার। বুবু গাড়ি নিয়ে আসবে। যেতেই হবে।

আহা, আসল কথাটাই তো বলনি। যাব কি যাব না ঠিক নেই আগেই গাড়ির বন্দোবস্ত। তোমাদের কিসের মিটিং সেটাই জানিনা।

জানবেন স্যার। নিশ্চয়ই জানবেন। তার আগে একবার হ্যাঁ বলুন। আমরা কার্ডে আপনার নাম ছাপতে দেব। ওরে তপনা সেই কাগজটা এনেছিস। দে স্যারের হাতে। এতে পাবেন স্যার কিসের মিটিং, কোথায় হবে, কখন হবে। সব রেডি, শুধু আপনার নামটা দেওয়া বাকি। হ্যাঁ বলে ফেলুন স্যার।

দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা হয় না বাবা। তোমরা ভেতরে এসে বস। আর তোমাদের একজন নীচে গিয়ে সামনের বাদল মিস্তিরির চায়ের দোকানে ছয়টা ভাঁড়ের চা দিতে বল আমার নাম করে। চা খেয়ে তারপর কথা হবে।

ওরা সবাই ভেতরে এসে বসল।

বুবু গেল চায়ের অর্ডার দিতে।

ভাবছিলাম, এরা এমন কি মিটিং করবে যাতে আমাকে যেতে হবে সভাপতিত্ব করতে।

ওদের বসিয়ে পাশেই বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

চা দিয়ে গেল খাঁড়ু। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, এবার বল।

সমীর বলল, মুখটা টকে গেল। কিছু আছে স্যার।

মুখশুদ্ধি ?

আজ্ঞে মুখশুদ্ধি-ই বটে তবে সেটা হল একটা করে সিগ্রেট।

না। আমি তো সিগারেট খাই না।

বলেন কি স্যার! আপনার মত ওয়ার্লর্ড ফেমাস লোক সিগ্রেট খায় না। তাজ্জব ব্যাপার। বুবু তোর পকেটটা দেখতো। বাদল মিস্তিরির চায়ের দোকানে সিগ্রেট নিশ্চয়ই পাবি। স্যারের নাম করে একটা প্যাকেট নিয়ে আসবি। ভাল ব্র্যাণ্ড দেখে আনবি। না না, দেশলাই আনতে হবে না।

ওদের কথার ভঙ্গীতে বুঝলাম আমি কঠিন ফাঁদে পড়েছি। ভাবছিলাম কি করা উচিত।

বললাম, এবার বলে ফেল কোথায় যেতে হবে? কেন যেতে হবে?

নতুন বাংলা স্যার। নতুন বাংলা তৈরী করতে হবে। তার জন্যই মিটিং।

হেসে বললাম, পুরানো বাংলাকে আর ভাল লাগছে না বুঝি?

ছোঃ, এটা মরা বাংলা। তাজা বাংলা চাই স্যার নইলে আমাদের গতি হবে কি করে।

ঠিকই বলেছ। তা বেশ কত তারিখে? এগার তারিখে, দাঁড়াও ডায়েরীটা একবার দেখে আসি। কোন এনগেজমেণ্ট আছে কিনা দেখে আসি।

পাশের ঘরে গিয়ে থানায় একটা ফোন করে ঘটনা জানিয়ে রাখলাম।

থানাদার বললেন, অবিলম্বে তিনি নিজেই আসছেন।

ফিরে এসে বললাম, এগার তারিখে এনগেজমেণ্ট আছে দুপুরে। তবে সন্ধ্যার সময় যেতে পারি।

ওরা উৎসাহিতভাবে বলল, আমাদের বাঁচালেন স্যার। কিন্তু ভাষণটা বেশ শক্ত ভাষায় যেন দেবেন। মিটিং-এ হেভি ভীড় হবে। আপনি যে নতুন বাংলা গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছেন জেনে সবাই আসবে। ভয়ঙ্কর ভীড় হবে।

বুবু এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে হাজির হল। পাঁচজনে দশটা সিগারেট ভাগ করে নিয়ে বেশ মৌজ করে ধূমপান করতে আরম্ভ করল।

লালটু বেশ কয়েকটা সুখটান দিয়ে সিগারেটটা মেঝেয় ফেলে পা দিয়ে ডলতে ডলতে বলল, কিন্তু একটা জরুরী কথা বলা হয়নি স্যার।

বল।

আমাদের এই ফাংশনের হেভি খরচে নাজাই পড়েছে। তাই আমরা চাঁদা তুলছি। আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না চাঁদা তোলায়।

তা বেশ কিন্তু জোরজুলুম করে আদায় কর না যেন।

তা কেন করব স্যার। আমি নিবেদন জানাব। ধরুন, আপনার চাঁদা ধরেছি মাত্র দুশ টাকা। এমন কিছু বেশি নয়। টাকা তো হাতের ময়লা। এই সামান্য চাঁদা আপনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

আমি বিস্মিতভাবে বললাম, দুশ'।

সবাই একসঙ্গে বলল, হ্যা স্যার। অতি সামান্য ডিমাণ্ড। জোর জুলুম নয়। আমর অবস্থা বুঝেই চাঁদা স্থির করি। কেউ আপত্তি করে না। আপনি পিসিডেন আপনার খাতিরে মাত্র দুশ টাকা। ওটা দিতেই হবে। ওরে তপা রসিদটা নিয়ে স্যারের হাতে দে।

বুঝলাম বেশ পরিকল্পনা অনুসারে আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। একমাত্র মুক্তির উপায় হল পুলিশের আগমন। থানাতে ফোন করেছি। এতক্ষণ পুলিশের আসা উচিত মনে করছি। তবুও সময় কাটাতে হবে পুলিশ না আসা অবধি। কথায় কথায় ওদের আটকে রাখতেই হবে।

বললাম, তোমরা তো বলছ দুশ টাকা অতি সামান্য।

হ্যা, স্যার। ওটা আপনার পক্ষে নস্যি।

তোমরা তো বললে। আমার অবস্থা আমি বুঝি। তবুও চাঁদা যখন ধরেছ তখন কিছু দিতেই হবে। কিন্তু অঙ্কটা কিছু কম করতে হবে।

স্যার আপনি ঠিকই বুঝেছেন। চাঁদা দিতেই হবে। তবে নট এ পয়সা কম। আমরা বিশেষভাবে হিসাব করেই চাঁদার অঙ্ক ধরেছি। তা স্যার দিয়ে ফেলুন। দে তপা রসিদ বইটা। স্যার নিজেই লিখে দেবেন। নইলে লোকে বলবে জুলুম করে চাঁদা আদায় করছে নতুন বাংলা বিকাশ সমিতি। এই যে স্যার। লিখে ফেলুন।

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ।

আবার কে এল।

লালটুকে বললাম, আর পারা গেল না। দেখতো বাবা, কে এল?

লালটু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই কয়েক পা পেছনে সরে এল।

আরে লালটু যে! বলেই থানার মেজবাবু পরিমল দত্ত এগিয়ে এল। আবার বলল, তোদের এখানে কি কাজ? বা, তোরা সবাই আছিস। কিছু মতলব নিয়ে এসেছিস নিশ্চয়ই।

না স্যার। একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম। এই স্যার পিসিডেন তাই একটু উপদেশ নিতে এসেছি।

আরে তপার হাতে দেখছি বিল বই। দেখি। ওঃ তাই বলি, স্যারের ঘাড ভেঙ্গে কিছু আদায় করে চোলাই চলবে বুঝি। তা ভাল। আরে যাচ্ছিস কোথায়? সমীরের নামে তিনটে কেস ঝুলছে। তোকে তো খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। ওহে বিনোদ, সমীরকে আটক কর। ভাগ্যি এখানে এসেছিলাম। আপনার মামলাটার কিছু করা যাবে না, সেই খবর দিতে এসেছিলাম স্যার। তা ভালই হল। আসামী পেয়ে গেলাম। লালটুর পার্টি বড়ই হাঙ্গামা করছে ক মাস ধরে। নে, চল সমীর।

স্যার আমরা?

তোরা জামিনে আছিস। কোর্টে যাবি। তা স্যার, এদের চেহারা দেখে মালুম করা উচিত ছিল। আমাদের খবর দিতে তো পারতেন। কোন লোক নেই। তা বটে। বিনোদ আর সাঁইজি এদের হাজতে দিয়ে তোমরা বাজারটা রাউণ্ড দিয়ে এস। আমি আসছি।

বিনোদ আর সাঁইজি সমীরকে হাত চেপে ধরে নিয়ে গেল, পেছন পেছন বেরিয়ে গেল লালটুর দল।

পরিমলবাবু চেয়ার টেনে বসেই বললেন, সময়মত ফোন করেছিলেন মশাই নইলে আজ আপনার কপালে দুর্ভোগ ছিল। এদের কখনও ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আই হোল দিয়ে দেখে নেবেন।

বললাম, ঠিক বুঝতে পারিনি।

সব ঘটনা বললাম পরিমলবাবুকে।

এ রকম আটদশটা পার্টি আছে যাদের কাজ হল নিরীহ লোকদের ওপর জুলুম করা। এরা খুব বেশী চালাক। এরা কাজ করে বিশেষ পরিকল্পনা মত। আপনার ক্ষেত্রেও বেশ পরিকল্পনা মত এরা সদলে এসেছিল। কার্যসিদ্ধি না করে ফিরত না। বুদ্ধি করে আপনি ফোন করেছিলেন এটাই রক্ষা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমি ভাবছি কেন এটা হয়।

স্বভাব।

বললাম, ঠিক বলেছেন স্বভাব। মানুষের যা স্বভাব তাই পালন করতে না পেরে এরা ধীরে ধীরে সমাজবিরোধী হয়ে উঠেছে। বেকার সমস্যা, বর্তমান রাজনীতির খেলা যুব সমাজকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

আপনার কথা আংশিক সত্য। ওরাও তো মানুষ। ওদের যৌবনে সব ইন্দ্রিয় সজাগ অথচ ওদের সামনে কোন পথ খোলা নেই জীবনকে ভোগ করার। এদের অনেকেই শিক্ষিত, অনেকেই দক্ষ কারিগর অথচ কর্মসংস্থান করতে পারেনি। দরজায় দরজায় ঘুরেছে কাজের প্রত্যাশায়। শতকরা দশ জনও কাজ পায়নি, বাকি নব্বইজন বাবার হোটেলে বহু গঞ্জনা সহ্য করে বাস করছে।

বললাম, তাই ওদের নিজেদের ওপর ঘৃণা জন্মেছে ধীরে ধীরে, মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মেছে, সমাজবোধ হারিয়ে ওরা ধীরে ধীরে সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়েছে। ওরা স্বভাবে ছিল মানুষ। নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থায় ওদের স্বভাব বদল হয়ে ক্রমেই ওরা পরিণত হয়েছে পশুতে। যাদের চিন্তা করার দায়িত্ব ছিল এই জাগ্রত যৌবনকে কর্মমুখী করতে তারা মানুষের কথা ভাবে না, তারা ভাবে নিজের দলের কথা, গোষ্ঠীর কথা। মানবতাকে অসম্মান করতে এরা মানবতাবোধ হারিয়ে হিংস্র চতুর শৃগালে পরিণত হয়েছে।

পরিমলবাবু বললেন, এটা সবাই স্বীকার করে তার সঙ্গে আরও কিছু রয়েছে যা ওদের মানুষ হবার পথে বড় প্রতিবন্ধক। সেটা হল পরিবেশ। পরিবেশ, সব সময়ই সামাজিক অবস্থার আয়ত্তাধীন। সামাজিক পরিবেশ গঠন করে অর্থনীতি আর রাজনীতি। ইংরেজ রাজত্বকালে স্বাধীনতালাভ করাই ছিল মুখ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অর্থনীতিটা ছিল গৌণ। পরাধীনতার জ্বালায় অর্থনীতির বহ্নিতে দেশের মানুষ পুড়ে খাক্ হলেও কথা বলত না, যারা কথা বলত তাদের চিন্তা ছিল যেন তেন প্রকারেণ ইংরেজ বিতাড়ন। কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার পর ছবিটা পাল্টে গেছে। দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজির হল এদেশে। উত্তর ভারতে বাস্তুচ্যুতদের সমহিমায় পুনর্বাসন দিতে অকাতরে অর্থব্যয় করেছে ভারত সরকার কিন্তু পূর্বদেশে এসেই তারা হাত-পা গুটিয়ে উপদেশ বিতরণ করতে আরম্ভ করল। মুখের কথায় তো চিঁড়ে ভেজে না, চিঁড়ে ভেজাবার রেস্ত যখন পেল না তখন ওই মানুষের বিরাট অংশ অমানুষের উর্দি গায়ে লেপটে নিতে বাধ্য হল। এই যা দেখছি তা হল সেদিনের অবিমৃষ্য-কারিতার পরিণাম।

তবুও একটা কথা মনে হচ্ছে বার বার। রাজনীতির শিকার তো শুধু এই বাংলার মানুষ হয়েছে এমন তো নয়। উত্তর ভারতে এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন অংশে সমাজবিরোধীরা আরও বেশি সক্রিয়। তুলনামূলক ভাবে এই পাপ বাংলায় কম।

তার পিছনে রয়েছে বাঙ্গালী চরিত্রের অবদান। এমন সহনশীল উদার মতাবলম্বী মানুষ অন্য রাজ্যের মানুষ নয়। এরাজ্যে সর্বশ্রেণীর সর্বধর্মের ও সর্ববর্ণের মানুষ যত নিরাপদে বাস করে অন্য কোন রাজ্যে তা আজও সম্ভব হয়নি। এই তো ক দিন আগে রেইড করতে গিয়েছিলাম। ধরলাম তেইশ জনকে। কিন্তু!

থামলেন কেন, বলুন।

পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হয়েছে! বাংলাদেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক অধিবাসী মুসলমান হলেও তারা বাঙ্গালী। অথচ পাকিস্তান হাসেল হলে তখন দলে দলে উর্দুভাষী মুসলমান হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করতে ছুটে গিয়েছিল পূর্বপাকিস্তানে। রহিস উর্দুভাষী মুসলমানরা শিল্পবাণিজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করতে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল।

এটাই তো স্বাভাবিক। পাকিস্তান হাসেল করতে বাঙ্গালী মুসলমানরা রক্ত নিয়েছে ও দিয়েছে কিন্তু উর্দুভাষীদের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। অন্যের কষ্টার্জিত ফল ভোগ করাই তো বর্তমান যুগ ধর্ম। আমাদের দেশেও সেই একই অবস্থা। কংগ্রেস ছিল গদীতে। শিক্ষকরা আন্দোলন করল বেতন বৃদ্ধির জন্য। এরা সবাই বামপন্থী। এরা নির্যাতন সহ্য করল। কংগ্রেসী শিক্ষকরা আন্দোলন থেকে শুধু দূরেই ছিল না, তারা আন্দোলন বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। বেতন বৃদ্ধি হল, সেই বেতন বৃদ্ধির সুফল কিন্তু কংগ্রেসী শিক্ষকরাও আজও ভোগ করছে। কষ্ট না করেও তাদের কেষ্ট লাভ হয়েছে।

বললাম, ঠিক বলেছেন। বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছিল তাদের পুলিশ ও বামপন্থী ক্যাডাররা রাস্তাঘাটে ঠেঙ্গালো। অবশেষে বাসভাড়া কমল। তার ফল শুধু আন্দোলনকারীরাই ভোগ করছে এমন নয়, সবাই ভোগ করছে তাতে পুলিশও আছে আর আছে বামপন্থী ক্যাডারাও।

এটাই তো সবকালের প্রচলিত রীতি। জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলন আরম্ভ করল। পুলিশ তাদের পেটালো, বামপন্থীর তথাকথিত ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীও তাদের পেটালো। যখন সরকার নতি স্বীকার করে জুনিয়র

ডাক্তারদের দাবী নিয়ে আলোচনা করে বিহিত করার কথা মেনে নিল তখন একমাত্র আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররাই তার সুফল ভোগ করবে এমন নয়, সুফল ভোগ করবে ওইসব ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর সদস্যরাও।

বললাম, যা আলোচনা করছিলাম তা থেকে অনেক দূরে এসে গেছি আমরা।

পরিমলবাবু বললেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেই বাঙ্গালী মুসলমানরা বলল, বিহারীরা পাকিস্তানী, ওদের এদেশ থেকে চলে যেতে হবে। পাকিস্তানের কাছে আবেদন গেল বিহারী মুসলমানদের ফেরত নেবার কিন্তু পাকিস্তান রাজি নয় লক্ষ লক্ষ নতুন উদ্বাস্তুদের স্থান দিতে। বাংলাদেশ সরকারও ওদের থাকতে দেবে না। অতএব যে কোন উপায়ে বিহারী মুসলমানদের বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে হবে। সোজা পথ না পেয়ে চোরা পথে পাকিস্তানী বিহারী মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। তাদের সধর্মী উর্দুভাষী ভারতীয় অঞ্চলে গোপনে ঢুকে পড়েছে। স্থানীয় ঐসব মুসলমানরা নানা অজুহাতে তাদের জন্য রেশন কার্ড সংগ্রহ করে দিচ্ছে। অর্থাৎ এই সব কট্টর পাকিস্তানীরা রাতারাতি ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছে। অথচ এরা মনে প্রাণে পাকিস্তানী। যে কোন সময়ে এরা ভারতের অভ্যন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সম্প্রতি এর লক্ষণ দেখা গেছে উত্তর ভারতে। এসব জেনেও কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিকার।

বললাম, নিশ্চয় এসব করা হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে।

অবশ্যই। এরা ভোটার তালিকায় নাম উঠিয়ে খাঁটি ভারতীয় হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে শক্তিশালী করতে। বোধহয় লক্ষ্য করেছেন, ক্রিকেটে পাকিস্তান জেতা মাত্র এইসব এলাকায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, পটকা ফেটেছে। আপনি বলবেন, পুলিশ কি করছে? আমাদের হাত পা বাঁধা। যদি অনুপ্রবেশকারী আইনে কাউকে গ্রেপ্তার করি সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা চিৎকার শুরু করবে, গণতন্ত্র বিপন্ন, ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন, ইসলাম ইন্ ডেনজার। এইসব রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই আবার শাসক দলের। আমরা কি করব বলুন।

অর্থাৎ ভোটের কাঙ্গালরা ভারত বিরোধী কাজ করতে মোটেই পেছপা নয়।

এর সঙ্গে রয়েছে আর্থিক সম্বন্ধ। এইসব অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে অশান্তি জিইয়ে রাখতে আরবীয় দেশ থেকে প্রচুর টাকা পেয়ে থাকে। নানা পথে এই টাকা ভারতে আসে, তা নানা ভাবে এইসব লোকদের ও স্থানীয় সমাজ-

বিরোধীদের হাতে পৌঁছায়। এরই কিছু অংশ এই সব নেতারাও পেয়ে থাকে। এই কারণেই আমাদের মুখ বুজে থাকতে হয়। আজ যারা আপনার কাছে এসেছিল এরাও নেতাদের মদতপুষ্ট। এদের বিরুদ্ধে চার্জশিট আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু দলের নেতাদের নির্দেশে চার্জশিটে এমন ফাঁকফোকর রাখতে হয় যার ভেতর দিয়ে এরা নিরাপদে বেরিয়ে আসে আইনের দণ্ড থেকে।

বিচিত্র !

অতি বিচিত্র এই দেশ। দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সেই বহুকথিত বাক্য "সত্য সেলুকস বিচিত্র এই দেশ" আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনুভব করছি। দোহাই আপনার, এসব কথা কাউকে যদি বলেন তখন আমার নামটি উল্লেখ করবেন না। ছা-পোষা দারোগা। চাকরি সম্বল। জানেন তো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই যায় পুলিশের চাকরিতে। বেশির ভাগই ভারসাম্য রাখতে পারেনা, অর্থ অসৎ ভাবে উপায়ের রাস্তা খোলা থাকে। অনেকেই মদ্যপ লম্পটে পরিণত হয়। মানবিকতাবোধ তাদের নষ্ট হয়। অনেকে পাকা খুনীতে পরিণত হয়। অথচ এইসব লোক কাউকে এক মুঠো অন্ন দিতে পারেনা, কারও কর্মসংস্থান করে দিতে পারে না, কাউকে নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিতে পারে না, অথচ এরা নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন পশুর মত আচরণ করে জনসাধারণের উপর।

কিন্তু ভবিষ্যত ?

ভবিষ্যত চিন্তা যদি করত তা হলে পুলিশের ঘরে বিদ্যাসাগর আশুতোষের জন্ম হত। তা হয় না, কারণ সন্তানদের সুশিক্ষা দেবার শিক্ষা তাদেরই থাকে না। চোরাপথে, তোয়াজ করে উঁচু অফিসাররাও চেষ্টা করে তাদের অক্ষম অপদার্থ ছেলেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে। ওসব কথা থাক। যে কথা বলছিলাম, সেদিন ছটা পাকিস্তানীকে গ্রেপ্তার করেছিলাম। যথা সময়ে আদালতে পেশ করেছিলাম। কিন্তু কার্যকালে দেখলাম শাসকগোষ্ঠীর কোন বিধায়ক তাদের জামিন নিয়েছেন।

আমাদের দেশে সবই সম্ভব। কিন্তু সরকার কি সম্পূর্ণভাবে বিকারহীন !

সাকার লাভ করে যখন আঘাত আসে কঠিনভাবে। যখন যা করার তা না করে হঠাৎ কিছু করতে গেলে আধিক্য ঘটেই। সদাচারী ধর্মনিষ্ঠ অফিসারদের পরিণতি তো দেখেইছেন বিনোদ মেহতার জীবনহানির ঘটনায়। সাধারণ ভাবে মানুষ এতে ব্যথিত হয় কিন্তু কর্মনিষ্ঠ কর্মচারীরা ভীত হয়। সরকার এদের

নিরাপত্তা দিতে পারেনা। আজ আসি, তবে কাউকে আমার নামটি বলবেন না। তাহলে আমি বিপন্ন হব।

পরিমলবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তবে তার কথাগুলো আমার মনের কোণায় বার বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কেমন যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ একটা ভাঙছে তার পেছন পেছন আরেকটা এসে স্থান দখল করছে। কর্মনিষ্ঠা হল যাদের নৈতিক ধর্ম তাদের নিরাপত্তার অভাব যখন ঘটছে, অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে।

।। দুই ।।

দিন গেলেই রাত হয়, রাত গেলেই দিন হয়। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু রাতের অন্ধকারটা ফিকে হয় চাঁদের আলোতে। মানুষের জীবনে যে তমিস্রা তা অপনোদন করতে আকাশে সামান্যতম ফিকে জ্যোৎস্না সব সময় দেখা যায় না। আমাদের পাড়ার অনন্তবিলাসবাবু মাঝে মাঝে আপশোষ করে বলে থাকেন, বিবর্তনশীল পৃথিবীতে সব কিছুরই বিবর্তন ঘটলেও আমার কোন বিবর্তন ঘটেনি, যে অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই আছি।

অনন্তবিলাসবাবুর বিলাপের কারণ জানার আগেই জানা দরকার তাঁকে।

অর্থাৎ কেমন ব্যক্তি ! কেমন তাঁর ব্যক্তি জীবন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিন সকালে অনন্তবিলাস নিজেই তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে যখন ফিরে গেলেন তখন আমি আমাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি বুঝলে ? আমি বুঝলাম, সব ধুঁয়ো।

পৃথিবীতে যতগুলো মহৎ কাজের কল্পনা করা যায় অধিকাংশই রপ্ত করেছেন অনন্তবিলাসবাবু এবং পৃথিবীর যতগুলো আপত্তিজনক কাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তার যেন কয়েকটি তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে বিবর্তনের সুখ সুযোগ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে যার পরিণামে তাঁর অন্ধকার জীবন থেকে আলোকের জীবনে উত্তরণ আজও সম্ভব হয়নি।

বেশ হেঁয়ালি মনে হচ্ছে সবটাই। এবার খোলাখুলি বলা উচিৎ।

কলকাতায় ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে বেচাকেনা করত এক রাজস্থানী

ফেরিওলা। ফুটপাত ইংরেজ আমলের অবদান, উদ্দেশ্য ছিল পথিকদের নিরাপদে পথ পরিক্রমা। ইংরেজ যাবার পর ফুটপাতকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কার? উত্তর পাওয়া গেল, যে দখল করে রাখতে পারে তার। অর্থাৎ ফুটপাত পথিকদের নয়, জবর দখলকারীর। আর ফুটপাতে শোনা যায় যাদের আর্তনাদ তথা আবেদন তথা বেসাতির মৌখিক বিজ্ঞাপন তার ভাষা ও ভাষ্য বাংলা নয়। ভারতের রাষ্ট্রভাষা অথবা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষায় এরা বাৎচিত করে, এবং এদের আর্তনাদ শোনা যায়, শোনা যায় না মুক ফুটপাতের আর্তনাদ।

যে রাজস্থানীর কথা বলছিলাম, সে এখন কোটিপতি, বলেই থেমেছিলেন অনন্তবিলাসবাবু। সামান্য ফেরিওলা কি করে বড বড় কারখানার মালিক হল তা আমার বোধগম্য নয় দাদা, তবে কলকাতাটা ওদের, আমরা ওদের সেই যে কথায় বলে, ডোমেষ্টিক সারভেন্ট, তাই, ওদের আজ্ঞাবহ।

বললাম, এই তো ইতিহাস। একদিন ইংরাজ এসেছিল হাত জোড় করে, নবাব বাদশার করুণা ভিক্ষা করে নিজেদের ধন্য করেছিল। তারপর ইংরেজ মাস্টার আর নবাব বাদশার বংশধররা ডোমেস্টিক সারভেন্টের দায়িত্ব নিয়ে নিজামতী কবরখানায় বসে বিড়ি বাঁধছে আজকাল। এমনটাই ছিল দু'শ বছর আগে। কলকাতায় বাঙ্গালী রাজা নবাবদের ফ্রি ক্যান্টিনে ভোজন করে ওইসব রাজস্থানীরা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন রাষ্ট্রভাষা তাদের, রাষ্ট্রের মাস্টার ওরা আর আমরা হলাম গিয়ে ওদের ডোমেস্টিক সারভেন্ট এতে নতুনত্বই নেই। এটাই তো ইতিহাস।

তবে ওদেরও তো ভবিষ্যতে আবার নেমে আসতে হবে ফুটপাতে।

বললাম, এটাই তো স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। চাকা ঘুরছে, ঘুরবে।

লক্ষণ ভাল নয়।

আমি একমত।

দরজায় ঠক্-ঠক্ শব্দ।

দরজা খুলে দিল আমার বাড়ির কাজের মেয়েটা।

দাদাবাবু, একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দোর গোড়ায়। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মনে মনে হাসলাম। হায়রে চাওয়া, কিন্তু পাওয়া তো বহুৎ দূর অস্ত!

সাদরে না হলেও, অনাদরেও তাকে অনুমতি দিই নি। তবুও সে এল।

রোগা মেয়ে? বয়স? তা হবে বিশ-বাইশ। কোলে একটা ছেলে। প্রার্থী মেয়ে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই তোমার?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা।

বিরক্তির সঙ্গে বললাম, কথা বলছ না কেন?

কাজ খুঁজছি।

আমার এখানে কোন কাজ নেই। অন্যত্র চেষ্টা কর।

বাচ্চাটা মায়ের বুকে মুখ ঘষছিল। আমার সামনে বুকের কাপড় সরিয়ে দুধ খাওয়াতে লজ্জা পাচ্ছিল। বাচ্চাটা মুখ ঘষছে বুকে। ব্যর্থতার প্রমাণ রাখল কেঁদে।

বললাম, বাইরের বারান্দায় বসে ছেলেটাকে দুধ খাইয়ে নাও।

কোন কথা না বলে মেয়েটা বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল। শিশুও মায়ের বুকের দুধ পেয়ে চুপ করে গেল।

নিজে নিজেই পাগলের মত বললাম, কাজ চাই।

কাজ চায় পশ্চিম বাংলায় চল্লিশ লক্ষ লোক। এত বেকার ভারতের কোন রাজ্যে আছে বলে জানি না। পাঁচ-সাড়ে-পাঁচ কোটি লোকের চল্লিশ লক্ষ কর্মহীন। শতকরা হার অঙ্কের হিসাবে দেখতে হবে। কিন্তু কেন!

উত্তরটা দিয়েছিল নমিতা শীল।

দুঃশীলের মত নমিতা বলল, বাংলার চল্লিশ লক্ষ লোক বেকার নয়। শুধুমাত্র বাংলার হিসাব যদি করা হত তা হল দশ লক্ষও বেকার পাওয়া দুষ্কর হত।

তা হলে অঙ্কটা কি ভুল?

ভুল নয়। বাঙ্গালীর ছেলেরা অত বেকার নয়। তুমি তো জানো বিহার আর উত্তরপ্রদেশে ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা। এই দুই রাজ্যের লোক চাষের সময় দেশে যায় আবার চাষ শেষ হলে ফিরে আসে পশ্চিম বাংলার কলকারখানায়। এদের সঙ্গে বাংলার মাটির কোন সম্বন্ধ নেই। এরা পরভৃত শ্রেণীর। এরা কল-কারখানায় কাজ করে, এখন কিছু কল-কারখানা বন্ধ। এইসব কল-কারখানার শতকরা আশীজন মজুর বহির্বঙ্গের। এখন তারাই বেকার। আবার বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রতিদিন দলে দলে বেকার আসছে পশ্চিম বাংলায়। তারা জানে বঙ্গালয়ে গেলে মুটিয়া, রিক্সা, ঠেলা তাদের পেটের ভাত জোগাবে।

কিন্তু এরা কারা ?

ভূমিহীন চাষী। অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণীর। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে এরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এইসব ভূমিহীন চাষীদের কোথাও মাথা খোজার স্থানটুকুও নেই, এদের মা-বোনের মর্যাদা রক্ষাই দায়। এমন অবস্থায় এরা পশ্চিম বাংলায় আসতে বাধ্য হয়েছে! বেকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাই দশকে চল্লিশ করতে দেরী হয়নি।

তাহলে যারা বলে বাংলার বেকার সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ তারা ঠিক বলে না।

আমি বললাম, তুমিই ঠিক বলেছ নমিতা। বাঙ্গালী ছেলেরা চাকরি প্রত্যাশী। তারা চাকরি পায় না পশ্চিম বাংলায়। যারা অর্থনীতির অভিভাবক তারা বহির্বঙ্গের লোক। তারা বাংলার মূল বাসিন্দাদের চাকরি না দিয়ে তাদের দেশওয়ালা হিন্দীওলাদের ডেকে এনে পশ্চিম বাংলা ভর্তি করে ফেলছে।

সোজা কথা হল পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালা বেকারের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ নয়।

বললাম, বেকার তো রয়েছে।

কোন দেশে বেকার নেই বলুন তো দাদা। বৃটেন-আমেরিকা ত ধনীর দেশ। ওসব দেশেও বেকার সমস্যা একটা বড় সমস্যা।

সমস্যা সমাধানের পথ ওরা জানে। আমেরিকা চায় সমগ্র বিশ্বে রক্তপাত ঘটুক। অর্থাৎ সারা বিশ্বজুড়ে চলুক ঘোরতর লড়াই। লড়াইয়ের মুনাফা তাদের ঘরে যেন আসে, অপরের ঘরে আগুন দিয়ে নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের দুনো লাভ। যারা লড়াই করবে তাদের সকল পক্ষেই আসবে তাদের কাছে হাতিয়ার কিনতে। এক পক্ষকে লড়াইতে হাতিয়ার দিয়ে নামিয়ে দিতে পারল আক্রান্ত পক্ষও হাতিয়ার কিনতে তাদের দরজায় আসবে, মার্কিন হাতিয়ার নিয়ে উভয় পক্ষ লড়াই করবে। টাকা যেমন আসবে ঘরে তেমনি দেশের বেকার মানুষদের কর্ম সংগ্রহও হবে। এটাই তো ওদের দুনো লাভ। কিন্তু আমাদের তো লাভের চেয়ে ক্ষতির অবস্থাটাই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। প্রথম ক্ষতি হল যুবশক্তির অপচয়।

তা বটে। কাজ না পেয়ে অকাজে তারা নেমে পড়েছে।

বললাম, দ্বিতীয় ক্ষতি সরকার সচেষ্ট দেশ রক্ষায়। দেশের মানুষদের রক্ষার তাগিদ তাদের নেই। তাই বাজারে ছাপানো কাগজে ছেয়ে ফেলেছে। ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি, সঙ্গে সঙ্গে টাকার মূল্য হ্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

কথা শেষ করবার আগেই নমিতা শীল বলল, আমরাও কাজ চাই দাদা।

বললাম, আমরাও। সমস্যা হল কাজ কোথায়? দেখছি তিনটে ব্যবসা খুব জমজমাট। একটা হল গড, বিজনেস, দ্বিতীয়টা হল উৎকোচ, আরেকটা হল স্মাগলিং বিজনেস। ভাবছি কোন রকমে যদি এই ব্যবসায়ে নামা যায় ত হলে কাজের দুঃখ কমবে, দু-চার জনের সেই সঙ্গে রুচিরুজির ব্যবস্থাও হবে। কথাটা হচ্ছে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে। পারবে কি?

নমিতা শুনে কোন উত্তর না দিয়ে উঠে যাচ্ছিল। এমন সময় রুদ্রনারায়ণ স্কুল এসে আমাদের আলোচনার মাঝে বেরসিকের মত বলল, শচীন মুখুজ্যে মারা গেছে স্যার।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কোন শচীন মুখুজ্যে?

রুদ্রনারায়ণ মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে যেন তারিফ করল। বলল, ঠিক বলেছেন, গোটা হিন্দুস্থানে কম করেও দশ হাজার শচীন মুখুজ্যে থাকা উচিৎ। তাদের কেউ না কেউ প্রতি বছরে মরছে। তাই হিসাব মেলানো কঠিন। কিন্তু এই শচীন মুখুজ্যেকে আপনি চেনেন।

অর্থাৎ?

আমাদের মহকুমার যিনি এস-ডি-ও ছিলেন ইংরেজ আমলে। ভদ্রলোক ভাগ্যবান। নব্বই পেরিয়ে মরেছেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঢাকায় পেল্লায় বাড়ী হাঁকিয়েছিলেন। তখন তো জানত না, বাংলা দেশটাই ভাগ হবে। যখন সত্যি সত্যি ভাগ হল, ওপারের লোক এপারে ছুটতে আরম্ভ করল তখন শচীন মুখুজ্যেও ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাজির হলেন এপারে। মজার কথা হল শচীন মুখুজ্যের আদালতে যখনই আইন অমান্য আন্দোলনের আসামীদের হাজির করত তখন তার প্রভুভক্তি জল্‌জল্‌ করে উঠত। কমপক্ষেও ছয়মাসের মেয়াদ না দিয়ে কাউকে রেহাই দিতেন না।

তারপর?

তারপর আর কি থাকতে পারে বলুন। তাঁর দেওয়া দণ্ড পেয়েছিল নরেন দাস। একবার নয়, তিনবার। সাকুল্যে আঠার মাস কয়েদখানায় ছিলেন নরেনদা। দেশ ভাগ হবার পর নরেনদা হলেন রিফুইজি ক্যাম্পের মস্তবড় হোমরা-চোমড়া ব্যক্তি। এপারে এসেই শচীন মুখুজ্যে হাত পাতলেন সরকারের দরজায়। সেই দরজার প্রহরী ছিলেন নরেনদা। চিনতে পারলেন।

নরেনদা বললেন, কেমন আছেন স্যার?

স্যার। অবাক কাণ্ড! এই বানপুরের খোলা আকাশের তলায় শচীন মুখুজ্যেকে কেউ স্যার বলবে এটা কেউ ভাবতেও পারেনি।

শচীন মুখুজ্যে বলল, আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না।

নরেনদা হেসে বললেন, ঠিক বলেছেন স্যার। তিরিশ বত্রিশ সালের কথা। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। আপনার আদালতে কত হাজার আসামী হাজির হয়েছে। তাদের শতকরা কতজনকে জেলখানায় পাঠিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। চিনে রাখা খুবই মুশকিল। আপনি যখন নগরবাড়িতে মহকুমা শাসক ও বিচারপতি তখন আইন অমান্য করে তিনবার আপনার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। প্রতিবার ছয়মাস করে মেয়াদ হয়েছিল। প্রথমবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলাম। শেষবার আই-এ পাশের সংবাদ নিয়ে বের হয়েছিলাম।

শচীন মুখুজ্যে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কি ভাবছেন স্যার? আমাদের দেশে তো ছিলেন। দুর্গা ভাসানের সময় বাইজ খেলার নৌকাগুলো অনেক দূর থেকে গরুর গাড়ি চাপিয়ে নদীর ঘাটে আনা হত, তাতো দেখেছেন। আবার ফেরী ঘাটে নৌকায় করে গরুর গাড়িগুলো এপার-ওপার হতেও দেখেছেন। কখনও নৌকা গাড়িতে চড়ে কখন গাড়ি নৌকাতে চড়ে। এটাই তো ইতিহাসের বিবর্তন।

লজ্জা পেলেন শচীন মুখুজ্যে।

মৃদুকণ্ঠে বললেন, এখানে কি করছেন।

আমিও আপনার মত ভাগ্যতাড়িত তবে এখানে অন্যান্য ভাগ্যতাড়িত নারীপুরুষ শিশুদের ভালমন্দ দেখার কিছুটা দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন পশ্চিম-বাংলার সরকার।

এরপর হেসে বললেন নরেনদা, সেদিন আমি ছিলাম আপনার আদালতের কাঠগড়ায়। আজ আপনি ভাগ্যদেবতার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। আপনার মত লয়্যাল টু সার্ভিস আমিও। আপনি ইংরেজ সরকারের রাজ্য রক্ষা করছিলেন। আমি ইংরেজের অবিচারের যারা শিকার তাদের রক্ষা করার কিঞ্চিত দায়িত্ব পালন করছি। লজ্জার কিছু নেই স্যার। সবারই একই দশা। চলুন আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেই। কোন ভয় নেই এখানে। নির্ভয়ে চলুন।

নরেনদা কিন্তু ব্যঙ্গ করেননি। যথার্থ নিষ্ঠার সঙ্গে ভাগ্যতাড়িত মানুষদের

সেবা করেছেন। সে-ই নরেনদাও আর নেই। সত্যি দাদা, নরেনদা অদ্ভুত ভাল মানুষ। মাঝে মাঝে বলতেন, আর দুটো বছর জেলে থাকলে বি-এ পাশটা হয়ে যেত। নরেনদা বি-এ পাশ করেননি, কিন্তু তাঁর গভীর পড়াশোনো সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিত।

বললাম, শচীন মুখুজ্যে জবরদস্ত হাকিম ছিলেন। তখন তো বিচার বিভাগ আর প্রশাসন আলাদা ছিলনা। যে হাকিম সে-ই সর্বেসর্বা। তবে কোন দিন-ই তিনি তিনটের আগে আদালতে বসতেন না। পেশকার, পেয়াদা থেকে গোটা আদালতের কর্মচারীরা তাঁকে যমের মত ভয় করত।

একটা ঘটনা বলছি শোন।

এক ফরিয়াদি তাঁর মোক্তারবাবুকে বললেন, মোক্তারবাবু আমার মা মৃত্যু-শয্যায়। আজ যে কোন উপায়ে একটা দিন নিতেই হবে।

মোক্তারবাবু বললেন, এই বজ্জাত হাকিমের অভ্যাস হল ফরিয়াদী জবানবন্দীর তারিখে দিন চাইলেই সেই মামলা খারিজ করে দেয়। তোমার মামলাও খারিজ হয়ে যাবে। তোমাকে আজ সব সাক্ষী হাজির করতেই হবে। হাকিম তিনটের সময় এজলাসে বসবে, তার আগে ব্যবস্থা করতেই হবে।

মক্কেল বললেন, বাবু তিনটে পর্যন্ত আমার মা বাঁচবেন কিনা সন্দেহ।

মোক্তারবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, চেষ্টা করব। তবে খরচ হবে।

তা দেব কিন্তু দিন করতেই হবে।

সে সময় মোক্তার-উকিল সবারই ফি ছিল দুটাকা।

মোক্তারবাবু ঝাঁকুনি দিয়ে চার টাকা আদায় করে নিয়ে বললেন, আরও লাগবে। তুমি তো শহরেই থাক। কাউকে দিয়ে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও।

মক্কেল টাকা সংগ্রহে গেলেন।

মোক্তারবাবু ভাবতে থাকল কি ভাবে কি করা যায়।

মোক্তারবাবু ডাকলেন, গোপাল্লা।

গোপাল নন্দী তাঁর মুহুরী। বাবুর ডাক শুনে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

দেখ তো, আরজিতে এই মামলার কজন সাক্ষীর নাম আছে।

গোপাল আর্জির নকল দেখে বলল, সতের জন।

হাকিম বসার আগেই সতের জনের হাজিরা দেবে, বুঝলে!

মুহুরী সতের জনের হাজিরা দিল।

মোক্তারবাবু চার আনা পয়সা পেশকারকে দিয়ে বললেন, আজকেই এই সতেরজনের জবানবন্দী নেবার ব্যবস্থা করুন। অনেক সাক্ষী বাইরের লোক। তাদের আসা-যাওয়া করতে খুবই কষ্ট হয়। তার ওপর খরচের ধাক্কা আছে।

পেশকার কথাটা বুঝতে না পেরে মোক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মোক্তারবাবু হেসে বললেন, বুঝলেন না। চারটের পর এই মামলা তুলেই হাকিমকে বলবেন, হুজুর সতেরজন সাক্ষী। তাদের জবানবন্দী আর জেরায় রাত সাতটা হয়ে যাবে। বাস্। হাকিম কোন মতেই এতটা সময় দেবেন না, অর্থাৎ আরেকটা দিন দিতে বলবেন। কাজ হাসিল হলে ডবল দেব।

হাকিম এলেন সাড়ে তিনটেয়।

কয়েকটা নথিপত্র নাড়াচাড়া করার পর মোক্তারবাবুর মামলার নথি দিলেন পেশকারবাবু। নিচু গলায় কি সব বললেন। সঙ্গে সঙ্গে হাকিম বললেন, ইমপসিবল। দিন বদল করে নতুন তারিখ দিন।

মোক্তারবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ফরিয়াদী নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। পেশকার-বাবু ডবল অর্থাৎ আটআনা পেলেন। মোক্তারবাবু মক্কেলকে ডেকে বললেন, তোমার দিন আদায় করতে যা সওয়াল করতে হয়েছে তা আর কি বলব। দাও আর চারটাকা।

এই ঘটনা সবাই শুনলেও সবাই প্রশংসা করেছিল মোক্তারবাবুর উপস্থিত বুদ্ধিকে।

রুদ্রনারায়ণ চুপ করে শুনছিল। আমার বলা শেষ হতেই বলল, এই সেই শচীন মুখুজ্যে।

নমিতা শীল বলল, বিচার ব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে সেই ইংরেজ আমল থেকেই।

বললাম, বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলছি এটা চলে আসছে সেই সময় থেকে যে সময় থেকে বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীতে চালু হয়েছে। এই কারণেই লোকে ঠাট্টা করে বলে কাজীর বিচার। তবে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা জন্মায় বিচারকের ব্যক্তি চরিত্রের উপর।

রুদ্রনারায়ণ কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

বাধা দিয়ে বললাম, শচীন মুখুজ্যে এমন কি বিরাট ব্যক্তি যার জন্য

তোমাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে এবং এই সংবাদ পরিবেশনা করতে তুমি এখানে এসেছ।

রুদ্রনারায়ণ হাসল। হাসিটা বড় মিষ্টি। বলল, মোক্তারবাবু হলেন প্রফেশনাল ঠগ। আর হাকিম হলেন একটা উজবুগ। বঙ্কিমী ভাষায় ঘটিরাম ডেপুটি। তবে শচীন মুখুজ্যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্থাপন করেছিলেন অন্য কাজ দিয়ে সেই কাজের কথাটা মনে হতেই তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। শচীন মুখুজ্যে দাম্ভিক, উৎপীড়নকারী, ইংরেজের খয়ের খাঁ হলেও একটি ক্ষেত্রে ছিলেন খাঁটি হিন্দু এবং বাঙ্গালী হিন্দু। তোমরা তখন বাইরে থাকতে। এমন সময় ঘটনা।

অনেকটা রাত।

ঠিক সময় বলতে পারছি না। তবে দেড়টা দুটো হবে।

ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

মনে হল কারা যেন আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে. প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। আমার মত লোকের দরজায় মাঝ রাতে যারা আসে অথবা আসতে পারে তাদের উদ্দেশ্য কোন কালেই ভাল হতে পারে না। সহজ করে বলা যায়, পুলিশ ভিন্ন আর কেউ নয়। বেশিক্ষণ চিন্তার সময় ছিল না। উঠে বসলাম।

শুনলাম, মধুর আহ্বান, সুকুল আছিস নাকি ঘরে?

গলার শব্দ বেশ চেনা-চেনা।

উঠলাম। লণ্ঠনটা উস্কে নিয়ে দরজা খুলেই দেখি হাকিমের পেশকার বিনু সরকার। চোখ কচলে বললাম, কি ব্যাপার বিনুদা।

বিনু সরকার হড়বর করে বলল, তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। বড়ই বিপদ।

অবাক হয়ে গেলাম তার কথা শুনে। মাঝরাতে কেউ ঘুম ভাঙ্গালে নিশ্চিত-ভাবে বুঝতে পারি বিপদটা আমার অথচ আমার বিপদ নয়, ওদের বিপদ।

বিনু সরকার তাগাদা দিয়ে বলল, কি ভাবছ। চল। একটা গামছা নাও সাথে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। বললাম, কি হয়েছে বিনুদা।

বিনু সরকার আক্ষেপের সঙ্গে বলল, হুজুরের মা মারা গেছেন বিকেল বেলায়, তাঁর সংকার করতে হবে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তিন চার জন লোক

জুটেছে। অন্য লোক পাওয়া গেল না, তাই তোমার কাছে এসেছি হুজুরের দায় উদ্ধার করতে। নাও, দেরী কর না। মড়া যেন বাসী না হয় হুজুরের নির্দেশ।

রেগে বললাম, হুজুরের নির্দেশ শুনবে তার অধীনস্থ কর্মচারীরা আর কাঠ গড়ার আসামীরা। আমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলব, এতো ঠিক কথা নয় বিনুদা।

ঠাট্টা করনা সুকুল। হুজুরের মহা দায়। এই বিপদে কেউ নেই তাঁর পাশে দাঁড়াবার। এই তো সানু চক্রবর্তীর কাছে গিয়েছিলাম, সে বলল তার স্ত্রীর সাতমাস, মিলন গোঁসাইয়ের মেয়ে বলল, বাবা বাড়ি নেই, অম্বিকাচরণ হুজুরের চাপরাশি সেও সুযোগ বুঝে ঘরের ভেতর থেকে বলল, পেশকারবাবু, আমার ম্যালোরি, খুব দেহের তাপ। যেতে পারব নি। ঘুরে ঘুরে হয়রান। শেষে কালিদাস উকিল বললে, সুকুলের কাছে যান, তার দলবল আছে। তারা সবাই বামুন। তারা জাত মানে না, লোকের বিপদ আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই এসেছি।

ভালই করেছেন বিনুদা কিন্তু আমার দলবল ভেঙ্গে গেছে। নয়জনের পাঁচজনকে তোমার হুজুর জেলখানায় আটক রেখেছে। দুজন পালিয়েছে। আর দুজনের একজন এই শর্মা আর লেবু ভট্ট। লেবু সহজে যাবে বলে মনে হয় না। তবে বলে দেখতে পারি।

বিনু সরকার কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আর কাউকে পাবে না ভাই।

দেখতে হবে। তবে রাত তো শেষ হয়ে এল। এর মধ্যে খুঁজে বের করা কঠিন। তোমরা যাও খাটিয়া রেডি করতে বল, আমি দেখছি।

দেখা দেখি নয় ভাই। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে মাতৃদায় আপনার।

তা বলতে পার। হুজুরের মাতৃদায় আর আমার মাতৃদায় একই কথা হুজুর আমাদের মা-হারা। বুঝতেই পারছ। সরকারের নিমক খাই, নিমকহারামি করতে তো পারি না।

নিমক খাওয়ার কথাটা আজও মনে আছে দাদা।

বললাম, তারপর কি হল?

হবে আর কি। লেবু আর অনা অধিকারীকে সঙ্গে করে যখন হাকিমের বাংলা পৌঁছলাম তখন সকাল হতে আর বিলম্ব নেই। তিনজন বামুনের সঙ্গেই

শচীন মুখুজ্যে সপারিষদ উপস্থিত। আমরা তিনজন গিয়ে কাঁধ লাগালাম। কাক ডাকার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। যেতে হবে চার মাইল পথ। অভিরামপুর শ্মশান তো নেহাত কাছে নয়।

আমরা ছয়জন মাঝে মাঝে কাঁধ বদলে পৌঁছে গেলাম শ্মশানে।

কিন্তু হাকিম শচীন মুখুজ্যে সপারিষদ আমাদের পেছনে পেছনে এলেন, পুরুত মশায়ের সঙ্গে প্রেতপিণ্ড দিলেন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে। অব্রাহ্মণ যাতে তাঁর মৃতা জননীর দেহ স্পর্শ না করে সেদিকেও তাঁর নজর ছিল সব সময়।

পিণ্ডদান মুখাগ্নি করে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত নদীতে স্নান করে খোলা পায়ে হেঁটে ফিরে এলেন শহরে।

শ্রাদ্ধের দিন প্রায় সমাগত।

দোর্দণ্ড প্রতাপ মহকুমা শাসক শচীন মুখুজ্যে সপারিষদ আমার দরজায় এসে হাত জোড় করে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর মাতৃদায় উদ্ধার করার জন্য।

সত্যি দাদা সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

শচীন মুখুজ্যের মত হাকিম আমার বাড়ির দরজায় হাত জোড় করে দাঁড়াবেন, এটা কল্পনায় আনা সম্ভব ছিল না, অথচ সেটাই সত্য। শ্রাদ্ধবাসরে আত্মশ্রাদ্ধ দান সবই করলেন। বাংলার ঐতিহ্য ও হিন্দুয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন শহরের মানুষকে।

তাই বলছিলাম, শুধু শচীন মুখুজ্যে ইংরেজের অতি বশম্বদ হলেও ছিলেন খাঁটি হিন্দু। তাঁর মাতৃভক্তি, ধর্মে নিষ্ঠা আমার মনে বিশেষ স্থান করে রয়েছে সেইদিন থেকেই। ওঁকে ভালবাসি না কিন্তু শ্রদ্ধা করি মনে মনে।

নমিতা শীল সবটা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিচিত্র মানব চরিত্র। একই লোক জুলুমবাজ হাকিম, আবার সেই লোকই মাতৃসেবক। বিপরীত চরিত্রের সমাহার একই ব্যক্তিতে।

আমার কাজের লোকটা এসে বলল, সেই মেয়েটা আবার এসেছে দাদাবাবু।

কোন মেয়েটা?

সেদিন যার ছেলেটা কাঁদছিল। আপনি যাকে বললেন, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াও।

নমিতা শীল দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আজ চলি। কাজের সন্ধান পেলে খবর দেবেন।

কোন কথা না বলে হাসলাম।

কাজের লোকটাকে বললাম, ডেকে নিয়ে এস মেয়েটাকে।

সুকুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও চলি দাদা।

গম্ভীরভাবে বললাম, না। তুমি বস। ওরে, বাদল মিস্তিরিকে বল আর তিন-চার ভাঁড় চা দিয়ে যেতে। আজকের দিনটা বড়ই বেখাপ্পা মনে হচ্ছে। একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তোমরা আসাতে তাও কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

বাবু। দরজার ওপাশ থেকে ডাক ভেসে এল।

বললাম, ভেতরে এস। কিছু বলতে চাও? বল, তোমার কি দরকার।

দরকার নেই। একটু ফয়সালা করে দিতে হবে। আজ দশদিন ফুটপাতে পড়ে আছি কচি ছেলেটা নিয়ে। কেউ তো আশ্রয় দেয়নি, তাই একটা ফয়সালা করে দিতে হবে।

ফুটপাতে তো কয়েক হাজার মানুষ রাত কাটাচ্ছে। তোমার কি অসুবিধা?

অসুবিধা! বলেই মেয়েটা থামল। তারপর বলতে থাকে, আমার নাম দুলালী। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে আমার ঘর ছিল।

তারপর?

বলছিলাম হরিলালের কথা। তার সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে।

পেটের দায়ে কলকাতায় এসেছিলাম গাঁয়ের আরও পাঁচজন মেয়ের মত।

রোজই কলকাতায় আসি সকালে ফিরে যাই সন্ধ্যায়।

কাজ বলতে কিছুই ছিল না বাবু। কোনদিন কয়লা কুড়িয়ে, কোনদিন ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, কোনদিন গেরস্থ বাড়ির ফাইফরমাস খেটে কেটে যেত দিনটা। পরের দিনের চিন্তা কখনও করিনি।

আমার বাবা-মায়ের কথা বলছেন? বাবা ছিল মওলা, যারা সুন্দরবনে মধু আনতে যেত তাদেরই সঙ্গে বাবাও যেত। বে-আইনী কাজ। আমার বয়স তখন দশ। ছোট ভাইটার বয়স সাত, এমন সময় একদিন সুন্দরবন থেকে অছিমুদ্দিন এসে খবর দিল, আমার বাবা লতিফকে বড় শেয়ালে মেরেছে। মা খুব কাঁদাকাটি করল। আমরাও কাঁদলাম। দুমাস না পেরোতেই মা ভাইকে সঙ্গে করে অছিমুদ্দিনের ঘরে গিয়ে উঠল। সবাই বলল, মা নিকে করেছে অছিমুদ্দিনকে। আমি রইলাম পেছনে পড়ে। কেউ একবার তাকিয়েও দেখল না!

পাড়ার আবুমিঞার বিবি নেকজান আমাকে খুব ভালবাসত। খেতে দিত।

মাঝে মাঝে আমার মায়ের নাম করে গালাগালি করত। আমাকে বলত, তোর মায়ের গোরা গোরা রং আর পুরুষ্টু দেহটাই তোর বাপকে মেরেছে। ওই বেটা অছিমুদ্দি, তোর বাপকে খুন করে গাঙে ভাসিয়ে দিয়েছে তোর মাকে নিকে করতে। জানি না, কোনটা ঠিক। তবে মায়ের সঙ্গে অছিমুদ্দির আসনাই ছিল তা বুঝতে পেরেছি অনেক পরে।

অছিমুদ্দি আমাকে সহ্য করতে পারত না। বলত, হারামজাদীর চেহারাটা ওর বাপের মত। লতিফের মত হারামী হবে বড় হলে।

তাই ভাসতে ভাষতে এলাম কলকাতায়।

গাঁয়ের হাকিম আলি বলল, একটা কাজ করবি দুলালী?

বললাম, কি কাজ?

রোজ দুটো কলসী নিয়ে যাবি কলকাতায়। শেয়ালদা স্টেশন পার করে কলসী দুটো আমাকে দিবি, রোজ তিন টাকা দেব তোকে।

বললাম, খুব পারব। তবে কলসীতে কি থাকবে রে হাকিম?

হাকিম বলল, তাড়ি।

রাজি হয়ে গেলাম।

কদিনেই বুঝলাম এতে ভয়ডর নেই। ইস্টাশনের গেটে আর পুলিশকে যা দেবার তা দেয় হাকিম। এইভাবে এই ধান্দার কায়দা কানুন বুঝে ফেললাম।

আমি আর গোলাপী দুজনে মিলে টাকা জমিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করলাম। মেডিক্যাল কলেজের সামনে যে মসজিদ আছে সেখানে তাড়ির কলসী নিয়ে বসতাম। রোজ আমরা দুজনে চার কলসী তাড়ি বিক্রি করে বাড়ি ফিরতাম।

কাজ কিছুই নয়। সন্ধ্যার বেলায় তাড়ি কেনা, সাত সকালের গাড়ি চেপে কলকাতা, তারপর বিক্রি করে বাড়ি ফেরা।

আমার তাড়ির খদ্দের ছিল হরিলাল; মুলুকের লোক। দেশওয়ালী ভেইয়া। কোথাও কাজ করত। সকাল বেলায় আসত, তাড়ি খেয়ে পয়সা দিয়ে চলে যেত। অনেকে যা দাম দেয় তার চেয়ে বেশি দিত। বললে ও বলত, নিয়ে নে। তোর ইনাম।

আমার বয়স তখন সতের আঠারো।

দুনিয়াতে কেউ আমার নেই।

হরিলালের আশ্রয় পেলাম। বলল, সাদী করবি হামাকে।

কোন উত্তর দিলাম না। কয়েকদিন ভাবলাম। শেষে একদিন বললাম, করব।

আমি মোল্লা, ও হল দোসাদ।

বিয়ে করলাম। কোন আইনে তা জানি না। নারকেলডাঙ্গার এক বস্তিতে তার ঘর। সেইখানেই বিয়ে। পাঁচ-দশ জন এল, মালা বদল হল। সবাই বলল, বিয়ে হল।

ঘর বাঁধলাম হরিলালের সঙ্গে।

হরিলাল মেহনত করে খেতে দিত। জামা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে সিনেমা দেখতেও যেতাম। বস্তি ঘরের সংসার সাজিয়েছিলাম বাবু। এইভাবেই দুটো বছর কেটে গেল।

একদিন হরিলাল বলল, হামার মাকো বিমার। মুলুক মে জায়গা। আনে মে দের হোগা।

আমি একা থাকতে পারব না। তুই না থাকলে কে আমাকে খাওয়াবে।

হরিলাল সেদিন আর জবাব দিল না। আমিও জুলুম ধরলাম সঙ্গে নিয়ে যেতে।

শেষ পর্যন্ত হরিলালের সঙ্গে আমিও গেলাম তার মুলুকে।

রেল থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম তার বাড়িতে। পাকা আট মাইল পথ। বেহারের গরম, তার ওপর খোলা মাঠ। দেহটা পুড়ে যাচ্ছিল! অনেক কষ্টে তো পৌঁছলাম।

সেখানে আমাকে কেউ ডেকে বসাল না।

আমি জানতাম না দেশে হরিলালের বউ আছে। আমাকে দেখে হরিলালকে তার বউ জিজ্ঞেস করল, ইয়ে কৌন হে?

রাখেলা। তুহার বালবাচ্চাকো দেখ ভাল করেগা।

আমার মাথায় বাজ পড়ল। হরিলালের বিয়ে করা বউ মজুত। মজুত তার তিনটে ছেলেমেয়ে। আমি হলাম ওর রাখেলা। মানে বউ নই রক্ষিতা। আমার সঙ্গে ওর বিয়েটা শুধু খেলা।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম।

ঝগড়া-কোঁদল হল। ওরা হিন্দীতে কি বলল কিছুই বুঝিনি। দেহাতি হিন্দীতে নিশ্চয়ই গালিগালাজ করছিল। আমিও আমার ভাষায় গালাগালি করলাম। কেউ কারও কথা না বুঝলেও কথার লড়াইটা ভালই জমেছিল।

সহ্য করতে পারলাম না। হরিলাল লাঠি নিয়ে তেড়ে এল।

সেই দিনই আবার আট মাইল পথ হেঁটে ফিরে গেলাম রেল স্টেশনে। কিন্তু পাপ তখন পেটে। ক মাস পরে খোকা এল।

এবার ফয়সালা করুন। ছেলেটা কার। ওটা হিন্দু না মুসলমান।

অভিনিবেশ সহকারে তার কথা শুনলাম। কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

বাবু বলুন ছেলের কি পরিচয় হবে।

বললাম, এখন কোন পরিচয় দরকার নেই। ও একটা মানুষের বাচ্চা। এটাই ওর বড় পরিচয়। বড় হয়ে ও নিজেই ঠিক করবে ওর পরিচয়।

দুলালী চুপ করে বসে রইল। তার কোলে ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম।

একজন সমাজ বিজ্ঞানী শহরের বারবণিতা পল্লীর নারীদের নিয়ে সমীক্ষা করে সংবাদপত্রে একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন। সেই সমীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে একটি ভয়াবহ চিত্র ছিল। সেই চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

শহরের বারবণিতাদের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই দরিদ্র মুসলমান সমাজের মেয়ে। শরীয়তী আইন তাদের রক্ষা করতে পারেনি। বেশির ভাগই তালাকি বিবি অথবা সতীনের ঘর করতে অনিচ্ছা জানিয়ে ঐ পথে এসেছে। এরা নিরাশ্রয় হয়ে পেটের দায়ে দেহবিক্রয়ের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে কিছু সমাজ বিরোধীদের চক্রান্তে। শহরে এসে এরা নিজেদের নাম বদল করে হিন্দুদের মত নাম নিয়েছে। দুলালীর সমস্যা আরও গভীরে।

জাহানারা বিবি বিয়ে করেছিল মুলুকের স্বামীকে। সেই বলেছিল, এখানে এসে মিঞা সাহেবরা নতুন বিবি খুঁজে নেয়, মিথ্যা বিয়ের আয়োজন করে কিন্তু কাবিলনামায় সই করে না কেউ-ই। যদি বা কখনও কাবিলনামা সই করতে বাধ্য হয় তখন বউকে ফাঁকি দিয়ে কাগজখানা নিজের কব্জায় নেয়। সময় বুঝে কাবিলনামা পকেটে নিয়ে মুলুকে চলে যায়। সেখানে তাদের বিবি বাচ্চা আছে। তাই নতুন বউয়ের দাবীটা যাতে স্বীকার করতে না হয়, যাতে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে তার জন্য এই সব অকাজ করে থাকে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার কাবিলনামা আছে তো?

আছে। একখানা মিঞার পকেটে, আরেকখানা আমার ভাইয়ের কাছে। আমরা যে জানি ওই সব মুলুকি আদমি এদেশে এসে নতুন মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করে। মিথ্যা বিয়ের কথা দিয়ে সবাইকে ভোলায়। তারপর সুযোগ পেলেই

পালায়। গরীব ঘরের মেয়েদের পথে বসিয়ে এরা পালায়। আদালতে গেলে বিয়ে প্রমাণ হয় না। তখন নতুন বউ হয় রক্ষিতা। কোন কথা বলার উপায় নেই আমাদের। মোল্লা মওলবীরা শরীয়তের হুমকি দিয়ে চুপ করিয়ে রাখে।

জাহানারা অল্প কথায় যা বলেছিল তারই পরিণতিতে যা ঘটে তা কলকাতার রেডলাইট এলাকায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু দুলালীর ব্যাপার একই রকম হলেও, এটা দুটো আলাদা সমাজের কথা। হিন্দু মেয়েকে মুসলমান ঘরে যতটা মর্যাদা দেওয়া হয়, মুসলমান মেয়েকে হিন্দুর ঘরে তার কণা মাত্রও মর্যাদা দেওয়া হয় না। এই সমস্যার আবর্তে দুলালী ঘুরপাক খাচ্ছে।

বললাম, দুলালা তুমি কোন গেরস্তবাড়িতে কাজ খুঁজে নাও।

নিতেই হবে বাবু। তবে মোল্লা শুনলে হিন্দুপাড়ায় কাজ পাব না। মুসলমান পাড়ায় কাজ দেবার লোক কোথায়? শহরে রহিস মুসলমান সবাই মুলুকী। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই বাবু। তার ওপর ওদের ঘরের বাঁদীদের মান ইজ্জত থাকে না।

দুলালীকে স্তোকবাক্য শুনিয়ে সেদিন বিদায় করলেও কেমন একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম। মানুষ তো ভগবান নয়। তাদের মানুষ হবার মত সব রিপুই থাকে প্রবল। নর-নারীর সাহচর্য ও যুগ্মজীবন তো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। সভ্যতার যত বিকাশ ঘটেছে ততই জটিলতা দেখা দিয়েছে সমাজ-ব্যবস্থায়। সমাজরক্ষার জন্য ধর্মকে আমদানী করেছে। নীতি কথা শুনিয়েছে কিন্তু তাতে কতটা মানবধর্ম রক্ষিত হয়েছে তা আজও গবেষণার বস্তু হয়েই আছে। সভ্যতার অভিশাপ হল মানবতার অপমৃত্যু। তাও সম্ভব হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে।

দুলালী চলে যেতেই স্কুল বলল, সব শুনলাম। এবার চলি।

কিছু বললে না তো।

এটা তো বলা কওয়ার বাইরে। ফয়সালা করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। তবে একটা বিষয় জেনে খুশী হলাম, এই সব দরিদ্র মানুষদের কোন ধর্ম বর্ণ নেই। এরা শুধু বাঁচার জন্য পৃথিবীতে এসেছে। আবার ফিরেও যাবে একদিন বাঁচার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে। কেউ অশ্রুপাত করবে না, কেউ হা হুতাশ করবে না। সব কিছু ঈশ্বরের কৃপা ও ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে মেনে নেবে।

তিন ॥

আজ আবার অনিল, নির্মল আর স্বাগতা এসেছে।

অনেক দিন ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। এরা কেউ বেকার নয়, কাজ করে খায়। অবশ্য কাজগুলো কোন রাজকীয় নয়। তবে রাষ্ট্রসেবার কাজ। তিনজনই সমবয়সী ও সমপাঠী, বিদ্যাবুদ্ধিতে কেউ কম নয়।

স্বাগতা বলল, দাদা যে আজকাল ঘরের বাইরে বের হন না।

কোন উত্তর না দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। ইঙ্গিত বুঝে চেয়ার টেনে নিয়ে তিনজনেই বসে পড়ল।

বললাম, একটু গরম গরম চা হলে বোধহয় আসরটা জমবে ভাল। কেমন ?

সবাই একসঙ্গে বলল, মন্দ নয়।

কাজের লোকটাকে পাঠালাম বাদল মিস্তিরির দোকানে।

একটা মজার ঘটনা ঘটেছে দাদা, বলেই নির্মল স্বাগতার দিকে তাকাল।

স্বাগতা উৎসাহের সঙ্গে বলল, তোকে আর বলতে হবে না, আমি-ই বলব।

তার আগেই চা এসে যাবে, গলাটা ভিজিয়ে নাও। বেশ গড়-গড় করে মজার ঘটনা বলতে পারবে। কেমন ?

নির্মল বলল, অবশ্যই। এই তো এসে গেছে। দাও বাবা।

থাঁদু সবার হাতে এক ভাঁড় করে চা দিয়ে বিদায় নিল।

এবার বল স্বাগতা, বলেই আমি ভাল হয়ে বসলাম।

স্বাগতা বলল, আমার জ্যাঠাইমার দেব-দ্বিজে ভীষণ ভক্তি। সপ্তাহে এক দিন সেই বারের ঠাকুরের দিন অর্থাৎ শনিবারে অবশ্যই গঙ্গা স্নান করেন। গঙ্গার ঘাটে যাবার আগে এক-মুঠো খুচরো পয়সা নিয়ে যান দান খয়রাত করতে।

কিন্তু খুচরোর অভাব ছিল কিছুকাল তা তো জানেন। সেইজন্য বাটা দিয়ে বাজার থেকে জ্যাঠাইমা স্বয়ং খুচরো সংগ্রহ করে থাকেন। সংগ্রহটা করেন সপ্তাহের প্রথম দিকে। আমাদের বাড়ির সামনে যে গলিটা সেটা মিশেছে বড় রাস্তায়। এই মিলনকেন্দ্রে থাকত কোন এক শনিতাড়িত ভাগ্যান্বেষ। বারের ঠাকুরের মূর্তি গড়ে পূজা করেন প্রতি শনিবারে। জ্যাঠাইমা প্রথম দর্শন মাত্র একটি আধুলি ছুঁড়ে দেন ঠাকুরের পায়ের তলায়। এটা তাঁর সাপ্তাহিক কর্ম।

গত সপ্তাহে খুচরোর বড় অভাব। জ্যাঠাইমা বের হলেন খুচরো খুঁজতে।

বাজারের সামনে একটা দোকানে এসে থামলেন। অতি বিনীতভাবে পাঁচটাকার খুচরো চাইতেই মালিক খুশী মনে বললেন, বাটা দিতে হবে কিন্তু।

জ্যাঠাইমা রাজি। প্রয়োজনে মানুষ কিনা কাজ করে বলুন। পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় খুচরো নিয়ে যে লোকটি হাজির হল তাকে দেখেই জ্যাঠাইমার চক্ষু চড়কগাছে। যে লোকটা আমাদের গলির মুখে শনির ব্যবসা করছে, এই লোকটি হল সেই শনি ব্যবসায়ী। শনির নামে যে পয়সা আদায় হয় তাতেও তার মন উঠে না। খুচরোগুলো বাটা নিয়ে বিক্রি করেও কিছু উপার্জন করছে। ব্যাস্। জ্যাঠাইমা খেপে গেলেন। বাড়িতে এসে গুম হয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল জ্যাঠাইমা?

উনি বললেন, সব জোচ্চোর। দেবতার নামে ব্যবসা করছে! ওদের মুখে আগুন।

জ্যাঠাইমা সব কথা বলার পর আমি বললাম, এটা নতুনতো কিছু নয়। তোমাদের সর্বপূজ্য কালীঘাটের কালীর সেবাইতদের কেউ কেউ এই ব্যবসা আজও চালু রেখেছে। একশ টাকায় দশ টাকা বাটা। কালীর ব্যবসা তার সঙ্গে খুচরোর ব্যবসা তো অনেক দিন থেকেই নির্বিবাদে চলছে। তোমরা বিশ্বাস করে যা দাও তাই ফিরে আসে অবিশ্বাসের গোপন দরজা দিয়ে। ব্যাস্। জ্যাঠাইমা আর গঙ্গায় যান না। খুচরো দেওয়া তো বন্ধ। দান খয়রাতে ভাঁটা পড়েছে জ্যাঠাইমার।

অনিল হেসে বলল, গড বিজনেস সম্বন্ধে সবাই ওয়াকিবহাল। পৃথিবী প্রায় সব দেশেই গড বিজনেস বেশ জমজমাট ব্যবসা। আমরা তো এতকাল শুনেছি ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। ভিক্ষা করতে জানলে সম্পদ সৃষ্টি হয় তা কি জানা আছে।

নির্মল বলল, একদল সমাজবিরোধী আছে যারা ছোট ছোট ছেলে চুরি করে। সেইসব ছেলেদের অন্ধ খঞ্জ করে তাদের দিয়ে ভিক্ষা করায়। এ থেকে তাদের প্রচুর মুনাফা হয় শুনেছি। পুলিশ তৎপর হয়েও এ ব্যবসা বন্ধ করতে পারেনি।

হেসে বললাম, আমাদের সংবিধান সবাইকে কাজ করার অধিকার দিয়েছে, এটা ভুলে যাও কেন!

অনিল বলল, সবাইকে কাজ করার অধিকার দিয়েছে, অকাজ করার অধিকার তো দেয় নি। তবে বলতে পারেন, অকাজও কাজ।

নির্মল বলল, আমরা অকাজ যাকে মনে করি সরকার তা হয়ত মনে করে না। আমরা মনে করি দেহ ব্যবসায় অকাজ কুকাজ, কিন্তু সরকার তা মনে করে না। ইংরেজ সরকার দেহ ব্যবসায়ীদের যেমন লাইসেন্স দিত তেমনি বর্তমান সরকারও দিচ্ছে। অনেকে বলেন সমাজ রক্ষার জন্য এই দেহ ব্যবসায়ীদের অবদান অনেক, অথচ প্রবক্তারা কখনও বলেন না তাঁর স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী অথবা জননীকে দেহ পণ্য ব্যবসায়ী হতে।

বললাম, আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। আমরা সব কিছুর সার অংশ গ্রহণ করতে রাজি যদি তা অপরের কষ্টার্জিত হয়। আমরা বিপ্লব চাই। কিন্তু বিপ্লবের ঝুঁকি নিতে চাই না। অপরেব ছেলেরা মরুক বিপ্লব যজ্ঞে কিন্তু আমার ছেলে যেন না মরে। এটাই, আমাদের কাম্য। বিপ্লব সার্থক হলে আমরা সর্বাগ্রে বিপ্লবের ফল গ্রহণ করতে যাব, অবশ্য অপরের ত্যাগে যদি তা তা হয়। ঠিক এই রকমই পুরুষের লালসা পরিতৃপ্তির কেন্দ্র হোক অপরের কন্যা বধু ইত্যাদি কিন্তু আমার কন্যা বধু যেন তা না হয়। এই মানসিকতাই সমাজের অতি জঘন্য এই পেশাকে সমাজ রক্ষার হাতিয়ার মনে করে থাকে।

অনিল বলল, দাদা, আমরা অনেক বেশি ভাবতে আরম্ভ করেছি, যেটা বলছিলাম সেটা শোনার চেয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ করেছেন। সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রে বারবণিতার অবস্থান আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আমাদের আকালুর মত লোকের কথা ভাবতে চেষ্টাও করি না।

বললাম, আকালু আবার কে ?

রোজ সকালে আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে গেলে দেখতে পাবেন একটা ক্র্যাচ্ নিয়ে যে লোকটা দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ায় তার নাম আকালু। বর্তমান নিবাস ফুটপাত। অথচ গেরস্ত লোক। কোথাও কোন মেলা বসলে, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে আকালু সেখানে উপস্থিত। বিশেষ করে মুসলমানদের যে কোন পরবে আকালুকে মসজিদের সামনে, অথবা কোন গাছতলায় চট বিছিয়ে থাকতে দেখবেন। হিন্দুদের গ্রহণ অথবা চড়কের মেলায় আকালু ইজ্ এ মাস্ট।

শুধু আকালু কেন এমন অনেক আকালু-ই তো থাকে।

অনিল বলল, আকালুর বিশেষত্ব হল মুসলমানদের পরবে হাজির থাকা। মাথার মাঝে কাপড়ের একটা টুপির আচ্ছাদনে আকালু দুহাত পেতে বসে থাকে।

মুসলমান ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জাকাত দেবার যে রীতি তা থেকে কোন মুসলমানই সহজে নিজেকে দূরে রাখে না। সারা বছরের সঞ্চয় অনেক সময় অনেক ধার্মিক মুসলমান অকাতরে দান করে। সেই দানের সামান্ত যে ছিটে-ফোঁটা আকালুর হাতে পৌছায় তা নেহাৎ কম নয়। পরবে ও উৎসবের উপার্জনে আকালু তার বউয়ের নামে পাঁচ বিঘে জমি কিনেছে। বউটিও খুব কর্মঠ। পাঁচ বিঘা জমি চষার ও ফসল উঠানোর দায় তার। এ বাদে সারা বছর আকালু যা উপায় করে তাতে তার সংসার বেশ সুখেই কাটে। আকালু ভিক্ষায় যখন বের হয় তখন তার পরণে থাকে নোংরা আধখানা ধুতি, অথচ তার বউ মালতী বেশ ছাপা শাড়ি ব্লাউজ পরে গ্রামে রাজার হালে থাকে। মালতী মাঝে মাঝে শহরে আসে। স্বামীর উপার্জিত অর্থ আঁচলে বেঁধে নিয়ে যায়। সময় সময় আকালুও যায় তার গ্রামের বাড়িতে। ঘর সংসার করে। তবে বেশি দিন মন টেকে না। মালতীকে প্রবোধ দিয়ে ক্র্যাচ বগলে করে বেরিয়ে পড়ে।

নির্মল হেসে বলল, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ কথাটা তা হলে ভুল।

অনিল বলল, অবশ্যই। কোন এক ইংরেজ অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন ইভিন্ বেগারস্ ইন্ ইণ্ডিয়া ম্যারি। উনি ভেবেছিলেন, ভিখারীর বউ থাকা অপরাধ। আজ এই আকালুর মত শত শত আকালু ভারতের শহরে শহরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের আর্থিক অবস্থা অনেক তথাকথিত ভদ্র পরিবারের চেয়েও ভাল।

স্বাগতা হেসে বলল, তা হলে আমরা সংবিধানের পক্ষপুটে অবস্থান করে কর্মের অধিকার লাভ করেছি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি।

নির্মল বলল, অবশ্যই। তবে সেই অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা তো সবার থাকে না। সেই ক্ষমতা যাদের আয়ত্বে তারা যে কোন কাজ করতে পারে। এই তো কিছুকাল আগে এক বোম্বাইয়া মন্ত্রী সুরা সেবন করে এমনই আত্মহারা হয়েছিলেন যখন পঞ্চম 'ম' কারের দ্বিতীয় 'ম'-কে কণ্ঠলগ্ন করার তীব্র আকাঙ্খায় বিমানসেবিকা মহিলাকে জাপটে ধরে বেইজ্জত করার জন্য এমনই বিশৃঙ্খল হয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর গদী ছাড়ার কারণ হয়েছিল। এই বোম্বাইয়া মন্ত্রী বিশ্বাস করতেন, বীরভোগ্যা নারী।

স্বাগতা বলল, তা বটে। এটা তো ভারতীয় কালচার। আমাদের দেব দেবতারা যেমন হামেশাই এই কর্মটি করেছেন তেমনটি আর কেউ করেছেন বলে শোনা যায় নি। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আর অহল্যার কাহিনী বাদ দিয়ে আরও

হাজার হাজার কাহিনী আমাদের মুনি-ঋষিরা নানা কাব্যে, মহাকাব্যে, বলে গেছেন যার তুলনা নেই। মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর সন্তানদের কথাও চিন্তা করা যায়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম বৃত্তান্তের সঙ্গে কুন্তীর চারিটি পুত্রও বোধ হয় বীরভোগ্যারই অবদান। আর বোম্বাইয়া মন্ত্রী এমন কিছু অঘটন ঘটায় নি। বোম্বাইয়া হিন্দী ছবির নায়ক, নায়িকা তাদের নাচগান, মারামারি, মদ্যপান আমরা আনন্দের সহিত উপভোগ করি অথচ বোম্বাইয়া মন্ত্রীর বেলেল্লাপনাকে ছোট করে দেখি এ তো হতে পারে না। সংবিধান এ বিষয়ে একেবারেই নীরব।

তাহলে তোমরা স্বীকার করছ, আকালু সংবিধান সম্মত কাজ করছে, বারের ঠাকুরের ব্যবসায়ীও সংবিধান সম্মত কাজ করছে। বারবণিতাও সংবিধান স্বীকৃত।

অনিল উপসংহার টানতেই স্বাগত বলল, ঠিক না হলেও বেঠিক নয়।

হেসে বললাম, এ আবার কেমন উপসংহার!

অর্থাৎ যা আমার কাছে বেঠিক তা আপনার সঠিক। আপনি বলবেন দেহ পণ্য নীতি বিরুদ্ধ, আমি বলব মোটেই নয়। রামায়ণের রামচন্দ্র যখন জন্মায় নি তখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞস্থানে আনতে রাজা দশরথ একদল বারাঙ্গণা পাঠালেন। কারণ এই ঋষিপুত্র কখনও নারী মুখ দেখেন নি তাই ছলনা করে তাকে আনবার জন্য মোহ সৃষ্টিকারী বারবণিতাদের সহযোগিতা নিতে হয়েছিল।

স্বাগত বলল, তারপর বৌদ্ধ যুগে নটীদের প্রাধান্য ছিল। তাদের ছলাকলায় কত অঘটন ঘটেছে। মহাকবি কালিদাস তো লক্ষহীরার দাসানুদাস ছিলেন। এসব তো আমাদের কথা নয়। এসবই অতীতকালের সুমধুর কাহিনী। আপনি বলবেন, এসব সত্যি হলেও সমাজে এদের স্থান কোথায় ছিল? যথেষ্ট প্রতিপত্তি নিয়েই এরা বাস করেছে রাজ অনুগ্রহে। আজও রাষ্ট্রের অনুগ্রহে জীবিকা চলছে। ভবিষ্যতেও চলবে, তাই এ বিষয়ে কোন উপসংহার টানা যায় না, যাবেও না।

নির্মল অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করেই ছিল হঠাৎ সে যেন সম্বিত ফিরে পেল। সদ্য নিদ্রোত্থিতের মত বলল, বিত্তের হিসাবটা কি বলতে পারেন দাদা?

বললাম, এতক্ষণ আমরা কর্মের অধিকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, এতে বিত্তের কোন স্থান ছিল না।

ছিল। বিত্ত দিয়েই সমাজ ব্যবস্থা বিচার হয়। বিত্তের তারতম্য আছে বলেই নারী আজ পণ্য, আকালুর মত সহস্র আকালু আজ পথের ধারে দাঁড়িয়ে, ধর্মের ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে চলেছে জমজমাটভাবে। তাই আমার প্রশ্ন হল, বিত্ত, বিশেষ করে বিত্তের হিসেবটা আমার জানা দরকার। তা যদি না হত তা হলে বোম্বাইয়া মন্ত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণও মোটেই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।

স্বাগতা বলল, ঠিক কথা হল না রে নির্মল। আগে যখন কেউ বলত, রামবাবু লাখপতি তখন আমরা লাখ বলতে কি বোঝায় জানার জন্য অঙ্ক কষতে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন লাখ বললে লোক গ্রাহ্যই করে না, তবে কোটিপতি বললে মোটমাট একটা টাকার ছবি চোখে ভেসে উঠে। বিত্তটা নির্ভর করে টাকার মূল্যের ওপর। টাকার মূল্য কমলে বিত্তবানের ওজনও কমে, আবার টাকার মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিত্তবানের ওজনও বৃদ্ধি পায়।

অনিল বলল, ওসব তথ্যের সঠিক হিসাব ও পরিচয় পাবে বাবা ত্রিমুখী নারায়ণ গিরি মহারাজের কাছে। ইনি ত্রিকালজ্ঞ। জোতিষ, জ্যোতির্বিদ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি যা কিছু বল, বাবা তার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়ে থাকেন। আমাদের হেবো সেদিন বলছিল বাবার হরেক ক্ষমতার কথা। তার কাছে গেলে বিত্তের সন্ধান দিতে পারেন।

নির্মল বলল, এই তো সহজ উপায়। উনি হাত দেখেন তো? অর্থাৎ পামিষ্ট্রি জানেন তো?

হেবো বলছিল, পামিষ্ট্রি তো ছোঃ। লেগেষ্ট্রিও জানেন।

স্বাগতা বলল, সেটা আবার কি?

হাত দেখা ও পা দেখা। রেখা বিচার। পামিষ্ট্রি ও লেগেষ্ট্রি।

ভালই বলেছিস অনিল। একবার যাচাই করে দেখ না। তোর তো সারা জীবন ধরেই অনেক সমস্যা। যদি লেগে যায় কিছু।

ঠাট্টা করছিস।

দেখ অনিল, তোর সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্বন্ধ? জানিস আমাদের বিমল সরকার এবার ভোটে জেতার জন্য স্বামী সঞ্জেয়ান্দের আশীর্বাদ চেয়ে ময়দানে নেমেছিল। স্বামীজি মহারাজ বলেছিলেন, সভায় যাবি, শ্রোতাদের সম্বোধন করবি, বন্ধুগণ।

বিমল বলেছিলেন, বন্ধুগণ তো বলব ভোট না হওয়া অবধি। তারপর?

স্বামীজী বললেন, যদি হেরে যাস, তখন বলবি শ্যালকগণ, আর যদি জিতিস তাহলে বলবি অজানাগণ।

তাদের প্রতিনিধি জিতলে তারা অজানাগণ বললে শুনবে কেন?

তখন বলবি, তুমি যে আমাকে ভোট দিয়েছ তার প্রমাণ দেখাতে পারবে! ভোটের বাক্স গোপন বস্তু। তাই অজানাগণ কোন উত্তর দিতেই পারবে না।

স্বাগতা বিমলের ভাগ্য নিরূপণের দিন অবধি সবাইকে অপেক্ষা করার উপদেশ দিয়ে বলল, তার চেয়ে বাবা ত্রিমুখী নারায়ণ ভাল। তোদের হেবোকে বলিস একটা দিন স্থির করে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে। অর্থাৎ তার কাছ থেকেই নির্মলের বিত্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে আসব।

নির্মল স্বাগতা ও অনিল উঠে দাঁড়াল।

বললাম, আসল কথা তো কিছুই বললে না।

তাইতো। দাদার পদধূলি গ্রহণ করতে কেন এসেছি তাতো বলা হয় নি।

স্বাগতা বলল, নির্মল তুই বল।

নির্মল বলল, অনিল তুই বল।

অনিল বলল, না, স্বাগতা তুই বলবে।

অনেকক্ষণ ভেবে স্বাগতা বলল, আমরা বিয়ে করব স্থির করেছি।

হেসে বললাম, ভাল কথা। তোমার পাত্রটি কে?

ওদের পাত্রীর হিসাব নিন, পরে আমার পাত্রের হিসাব দেব।

নির্মল বলল, পড়ন্ত পাড়ার মধুময়ী হল অনিলের ভাবী স্ত্রী।

আর উঠন্ত পাড়ার হাসু হল নির্মলের চয়েস।

বুঝলাম না তোদের হেঁয়ালি।

বলছি। আমরা পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম? প্রথমটা হল পড়ন্তপাড়ার মধুময়ী, রূপগুণের ব্যাখ্যা করে কোন লাভ নেই। বাঙালীর ঘরের সব মেয়েই সমান। কেউ একটু কালো, কেউ ধলো, কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ ঢ্যাঙা, কেউ বেঁটে। অবশ্য পাত্রীরা সবাই মহিলা। এটাই হল বিশেষত্ব। মধুময়ী তিনবার মাধ্যমিক দিয়েছেন, বয়স বাইশ অথবা তেইশ। গান করেন, দেবদ্বিজে ভক্তি অগাধ। আর তিনি ব্রহ্মচারী গুণদানন্দের মন্ত্রশিষ্যা। গলায় কাল ভৈরবীর কালো দড়ি, হাতে বাঁধা বিপত্তারিণীর ডোরে, তারকেশ্বরের সুতো, আঙুলে লোহার আংটি অর্থাৎ ঘোড়ার খুরের আংটি, বাঁ হাতে তাগা, তাগার সঙ্গে গোটা ছয়েক মাদুলি।

পাত্রী তোমাদের পছন্দ হয়েছে?

নির্মল বলল, আমার হয়নি স্বাগতার পছন্দ হয়েছে।

স্বাগতা আগ্রহ সহকারে বলল, হ্যাঁ দাদা, আমার পছন্দ হয়েছে। অনিলের জন্য এরকম পাত্রী উপযুক্ত। মেয়েটা কাজে কর্মে পটু। অনিলের সংসার সামলাতে পারবে। আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা শেখাতেন স্বর্ণপ্রসবিনী হও, সুগৃহিনী হও, পড়ন্ত পাড়ার মেয়েরা এ কাজটাতে বিশেষ পটু। তাদের ছিল, এখন তাদের নেই। তারা যখন উঠতি পাড়ায় যাবে তখন পড়ন্তের ছাপ ফেলতে মোটেই বিলম্ব করবে না।

অনিল বলল, রাইট। স্বাগতা আমার স্কন্ধে পড়তি বাড়ি ঘর ঝেঁটানো মাল চাপাতে চায়। কিন্তু নির্মলের জন্য উঠন্ত পাড়ার হাসু অবশ্যই উপযুক্ত।

কিন্তু স্বাগতার কথা তোমরা কেউ কি ভেবেছ?

সে ভাবনা স্বাগতার নিজস্ব। কারণ, স্বাগতা একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে শেষ অবধি পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে।

মিথ্যা কথা, বলেই স্বাগতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বলুন তো দাদা, অনিল ও নির্মল কি কোন নারী? পুরুষ বিদ্বেষী হলে ওরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আসত না। একা পুরুষ কোন কিছুই সম্পূর্ণ করতে পারে না, নারী তার সহচরী। আবার উল্টোটা পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য। এটা তো আমার অজানা নয়। তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেই জীবনের সব কিছুর সমাধান যে হয় না এটা জানতে আমার বিলম্ব ঘটেছিল ঠিকই কিন্তু সংশোধন করার সুযোগ আমি পেয়েছি। এর সঙ্গে নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ কোথাও তো নেই।

অনিল বলল, তাহলে বিয়েটা তো ছেলে খেলা নয়।

অবশ্যই।

সে জন্যই বুঝি তুই পড়ন্ত পাড়ার মধুময়ীর গলায় আমাকে ঝুলিয়ে দিতে চাস?

না রে না। মেয়েটা খুবই ভাল হবে দেখিস।

নির্মল বাধা দিয়ে বলল, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ কে বিচার করবে, তুই, না অনিল?

স্বাগতা বলল, বেহুলার মত বউ পেয়েছিল বলেই তো লখীন্দর জীবন ফিরে পেয়েছিল। বেহুলা যদি আমাদের মত স্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে হত তাহলে আমার মত ঘাড় বেঁকিয়ে আদালতে যেত। নইলে বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে গিয়ে নতুন বর খুঁজত।

আমি বললাম হুঁ।

কি হুঁ ?

বেহুলা আর লখীন্দর। চাঁদ বেনে আর সায় বেনে। হুঁ !

মহেশ কন্যা পদ্মা বুঝি হুঁ নয় !

দেখ ভাই, মনসামঙ্গলের গল্প খুবই মিঠে আর লোকমানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সবটা আজগুবী হলেও পদ্মা কিন্তু আজগুবী নয়। আজও ফণা তুলে পদ্মার অনুচররা শয়ে শয়ে মানুষকে শিবলোকে পাঠাচ্ছে। এটাই বড় সত্য।

স্বাগতা হাসল।

হাসছ কেন ? লোকসাহিত্য পড় অথচ বিশ্বাস কর না। ধর্ম ঠাকুর নিয়ে মাথা ঘামাও না কিন্তু মনসাকে বিশ্বাস কর। নয় কি ! কারণ, সে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

অনিল বলল, জানেন দাদা, নদীয়া জেলায় খেদাই গাছের তলায় শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা মেলা বসে প্রতি বছর। মনসার নামে দুধকলা যেমন আমদানী হয়, তেমনি নিরীহ পশুর রক্তে ভেসে যায় খেদাইতলা। আজও মানুষ বিশ্বাস করে সাপ দুধকলা খায়, পশুর রক্তে দেবী মনসার তুষ্টি হয়। সব কিছুর পেছনে যেমন থাকে একটা মনভুলানো প্রবাদ ও গালগল্প তেমনি বেহুলা ভাসানেও আছে গালগাল্প, খেদাইতলাতেও আছে লৌকিক প্রবাদ। তবে স্বাগতা, মধুময়ীকে বেহুলা হবার শিক্ষা দিয়ে অনিলের ভবিষ্যতটা নষ্ট কর না।

কিন্তু দাদা !

আবার কোথায় কিন্তু রয়েছে। খেদাইতলায় মনসাকে তুষ্ট করতে যেমন পশুর রক্তপাত ঘটে তেমনি পিতামাতা নামক নরনারীর রক্তপাত ঘটে মধুময়ীর মত মেয়েকে পাত্রস্থ করতে। বিবাহযোগ্য পুরুষ আমাদের দেশে হল ক্রয়যোগ্য বস্তু, কন্যায় পিতাকে এই বস্তু ক্রয় করতে হয় বুকের রক্ত দিয়ে। খেদাইতলায় পশুর রক্তপাত ঘটে শুনে যাঁরা আঁতকে উঠে তারাই পুত্রের বিবাহে কসাইয়ের ভূমিকা গ্রহণ করে। কন্যার জন্মমাত্র পিতামাতা চিন্তা করেন তার বিয়ের কথা। এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু ছা-পোষা পিতামাতা তো ছাগমূল্যে পাত্র ক্রয় করতে পারেন না। তাদের মূল্য দিতে হয় একভজন বলীবর্দের এরা হল লিনলিথগোর আমদানীকৃত স্টাড্ বুলের মত। প্রজননেরউদ্দেশ্যে পুরুষ ক্রয় আমাদের দেশেই সম্ভব।

নির্মল বলল, এটা শাস্ত্রের বিধি। শাস্ত্রে আছে সালঙ্কারা কন্যাদান বিধি।

চমৎকার তোমাদের শাস্ত্র। বেদের কোন অধ্যায়ে এই বিধি আছে তা আমার জানা নেই। যা বেদে নেই তা তো শাস্ত্র নয়।

বেদে না থাকলে তা শাস্ত্র নয়, এটা ঠিক কি ?

যতদূর জানি, হিন্দু বা আর্যধর্ম বেদের অধীন। যারা বেদ বিশ্বাসী তারাই হিন্দু। যেমন কোরাণ বিশ্বাসী না হলে সে লোক মুসলমান নয়।

বললাম, আইনে যেমন ব্যতিক্রম থাকে তেমনি ধর্মনিষ্ঠ লোকও অশাস্ত্রীয় কাজ করে। মুসলমানরা অত্যধিক ধর্মভীরু অথচ সুদ নেওয়া শাস্ত্রে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বহু মুসলমান সুদ নিয়ে থাকে। অশাস্ত্রীয় জেনেও পরধন বিদ্বেষ অনেকের মজ্জাগত। সব মুসলমান নমাজ পড়ে এমন তথ্য কারও জানা নেই, সব মুসলমান রোজা করে এটাও জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না, আবার জাকাত করা ধর্ম হলেও জাকাতের টাকা অনেকেই নিজের স্বার্থে ব্যয় করে। তবুও তারা মুসলমান। হিন্দু সমাজ কিছু উদার। শত শত বৎসরে শত শত অশাস্ত্রীয় বিধান তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে জনসমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বেদ বিশ্বাসী যে হিন্দু, কিন্তু কজন হিন্দু বেদের নাম শুনেছে বলতে পার। সালঙ্করা কন্যার বিধি কোন সময় প্রচলিত হয়েছিল বলা কঠিন কিন্তু পুরুষ সমাজ লোভের বশবর্তী হয়ে এই অশাস্ত্রীয় কাজটি শাস্ত্র সম্মত বলে জাহির করে নারী সমাজকে উৎপীড়ন করে চলেছে।

বর্তমানে পরিণাম ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে।

এই পরিণামকে তোয়াক্কা না করেই এই অপকাজ করে চলেছে। আমাদের শ্যামাপদের কথাই ভেবে দেখ। শ্যামাপদ এম. এ. পাশ করল, কলেজে মাস্টারী পেল। সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ক্লাশে পণপ্রথা নিয়ে লেকচার তাকে দিতে হয়। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে তার মত ছিল প্রবল। এমন সময় তার বাবা একটি পাত্রী মনোনীত করল।

শ্যামাপদ বলল, আমি বিয়ে করব না।

তার বাবা তো রেগে কাঁই। বলল, এত পয়সা খরচ করে তোকে লেখাপড়া শেখালাম কি চিরকাল তোর সেবা করার জন্য ? ঘরে লক্ষ্মী না এলে তোর মা আর কত পারবে !

মা-বাবা, পিসী-মাসীর অনুরোধ উপরোধে শ্যামাপদ বিয়েতে রাজি।

আমরা লোক পরম্পরায় শুনলাম কৃতী পুত্রের মূল্য ধার্য হয়েছে ষোল ভরি সোনা, নগদ আট হাজার টাকা আর নানা দ্রব্য।

শ্যামাপদকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেমন হল শ্যাম, বিয়েতে কন্যা পক্ষকে পণে বসিয়ে ঘরে লক্ষ্মী আনবে শুনছি।

শ্যামাপদ বলল, লক্ষ্মী-ই আনব দাদা। লক্ষ্মী মানেই তো টাকা। বউ কি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে করে আসবে। তাকে সম্পদ নিয়ে আসতে হবে নইলে সে লক্ষ্মী হবে কেন? লক্ষ্মীর সঙ্গে লক্ষ্য স্থলটা আমার বাবা ভুল করেন না।

তোমার আদর্শ?

শ্যাম বলল, ওসব কাগুজে কথা। শুনতে ভাল। জানেন তো, আই ক্যান্ টাচ্ টুয়ানটি বাট আই ক্যাননট্ বি ওয়ান অব্ দি টুয়ান্টি। তারপর বাবার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না, সে সাহসও নেই।

শ্যামাপদ বিয়ে করে কর্মস্থলে বউ নিয়ে চলে গেছে। লক্ষ্মী ও লক্ষ্য বস্তুর সব কিছুই সঙ্গে নিয়ে গেছে। একমাত্র নগদ টাকা বাদে। মায়ের সেবা করার কোন লোক আর পেছনে রেখে যায়নি। অর্থাৎ অপরের অর্থ পকেটস্থ করার সময় সবাই হয় বাবা-মায়ের সুবোধ সুপুত্র।

কিছুক্ষণ থেমে বললাম, ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে আমাদের সান্যাল বাড়ির ছেলে। রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। নকশাল আন্দোলনে একসময় বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সরকারী চাকরি নেবার আগ্রহ তার ছিল না, চাকরি নিল কলেজের মাস্টারী। বাবা-মা সবাই বিয়ে দিতে চায়। বিয়ে করলে রাজনীতির পোকার কামড় আর সহ্য হবে না, ঘরে আটক হবে! বিয়েটাই বড় দাওয়াই। সান্যাল বাড়ির ছেলে রাজি তবে কয়েকটি শর্তে। প্রথম শর্ত কোন পণ নেওয়া চলবে না, দ্বিতীয় শর্ত বিয়ে হবে রেজিষ্ট্রী করে কোন ধর্মীয় অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতে নয়। পিতামাতা এতেই রাজী হলেন। ছেলেকে আটকাতে হলে এর চেয়ে ভাল পন্থা যখন নেই তখন রাজি না হয়ে উপায় কি।

বিয়ে হল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করা গেল না। এমন কি শ্বশুর বাড়ির পরিধেয়টি পর্যন্ত নেয়নি সান্যাল বাড়ির কৃতী সন্তান।

স্বাগতা বলল, আদর্শ নিষ্ঠ।

অনিল বলল, ঘোড়ার ডিম, একটা পাগল।

নির্মল চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, এ রকম পাগল যেন ঘরে ঘরে জন্মায়।

আগন্তুক সবাই বিদায় নিল। কিন্তু তাদের বিবাহের সমস্যা মেটাবার কোন আগ্রহ দেখলাম না। তাই বসে বসে আজকের ঘটনাগুলো ভাবছিলাম এমন সময় কাজের লোকটি এসে বলল, দাদাবাবু স্নানের সময় হয়ে গেছে।

।। চার ।।

দাঁড়াও এগিয়ো না। সামনে বিপদ!

তাকিয়ে দেখলাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা পুরুষানুক্রমে পেটের জ্বালায় পথে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরই দুটো দল মারমুখী হয়ে কলহে ব্যাপৃত।

বুঝতে পারলাম না ঘটনাটা।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অনুধাবন করলাম, লড়াইটা ফুটপাতের জমিদারী নিয়ে। লড়াইটাতে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার। কেউ কম নয়।

একটা রোয়াকে গিয়ে চুপ করে বসলাম।

পাড়ার মোড়ল সনৎ চাটুজ্যে আমাকে একা বসে থাকতে দেখে সামনে এসে দাঁড়াল।

কি দেখছ ভায়া?

একটু হেসে বললাম, না কিছু না।

তোমার মত লোক এখানে অর্থাৎ রোয়াকে চুপটি করে বসে থাকার লোক নয়। নিশ্চয় কিছু মতলব আছে।

তা বলতে পারেন দাদা। দেখছিলাম লড়াই।

সনৎ চাটুজ্যে কিছুক্ষণ ভেবে আমার পাশে এসে বসল, হাঁ লড়াই। আমিও দেখছিলাম। জানো ভায়া। এদের বেশির ভাগই এসেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাদা অঞ্চল থেকে। এদের কপাল, দেশে পিতা পিতামহের যা কিছু দুচার ছটাক জমি ছিল তা মহাজন আর জোতদাররা গ্রাস করেছে, সে সময় ওদের লড়াই করতে দেখা যায়নি। দল বেদল ওদের সাথী হয়ে লড়াই করতে গেলেও ওরা কিন্তু তাদের সাথী হতে পারেনি। এখানে সাড়ে তিন হাত জমিতে রাত কাটাতে হয়। সেই জমির মালিকানা ওদের নয় অথচ ওরা লড়াই করছে।

তা বটে, এইটুকুই ওদের শেষ সম্বল। এরজন্য খাজনাটা ট্যাক্সটা দিতে হয় না, বেশ নিরাপদে থাকার মত জায়গা, তা থেকে বঞ্চিত কেউ হতে চায়।

সনৎ চাটুজ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, নিরাপদ মোটেই নয় ভায়া। এখানে ওরা গুবরে পোকার মত বাস করে। কখন যে কার পায়ের চাপে মরবে তারই বা ঠিক কি। আরও জোয়ান মেয়েরা তো বারবধূ। যার বউ তার ক্ষমতা নেই বউকে রক্ষা করে। শেষ রাতে যখন রাস্তার খেয়ো কুকুরগুলো কুঁই-কুঁই করে তখন পাড়ার মস্তানগুলো এসে টানতে থাকে জোয়ান মেয়েদের। মেয়েরা কুঁই-কুঁই করে আপত্তি জানায়। পাশের মরদ অসহায়ের মত ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মস্তানদের ভোজালি আর বোমার দিকে। তারপর যা হয় তা তো বুঝতেই পারছ। অথচ!

অথচ এদের পিতা পিতামহের একখানা ঘর ছিল সংসার ছিল। আর ওরা পেটের দায়ে সবকিছু হারিয়ে শেষ সম্বল ইজ্জতটুকুও হারাচ্ছে। এই তো।

কিন্তু আমরা স্বাধীন দেশে, গণতন্ত্রী দেশে বাস করছি।

হেসে বললাম, সনৎদা, গণ মানেই সমষ্টি। সমষ্টি যখন অসহায় যুবতীকে টেনে নিয়ে যায় তখনই তো গণতন্ত্রের মহিমা সবাই বুঝতে পারে, জানতে পারে।

গণতন্ত্রে তো এদের কোন স্থান নেই। তাই স্বামী-স্ত্রীর একক জীবন গণতন্ত্রে অচল।

সনৎ চাটুজ্যে চুপ করে গেল।

বললাম, আজকের লড়াইটা কিন্তু ফুটপাতের জমিদারী নিয়ে হলেও এটাতে আছে প্রাদেশিকতার গন্ধ। বিহার আর উত্তর প্রদেশের গণতন্ত্রীদের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্রীদের লড়াই। এটা তো সবাই জানে, গণতন্ত্রী হিন্দীওলার মুলুকে বেকার সংখ্যার কোন মা-বাবা নেই, হিসাব নেই। ওরা জানে বংগাল গেলে পেটের ভাত যে কোন ভাবে জুটবে, আর এক মাহিনা বাদ বিবি-বাচ্চাকে বেশ মোটা টাকা মনিঅর্ডার করাও যাবে। ওদের খাজনা ট্যাক্স দিতে হয় না। আপনা রাজকা গাড়িমে বিনা টিকিটে বংগাল আসাও যায়। তারপর ঠেলা, রিক্সা, মুটিয়ার জীবন সম্বল করে রাত কাটায় ফুটপাতে চট মুড়ি দিয়ে।

সনৎ চাটুজ্যে উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছ ভায়া।

একটা বিড়ি পকেট থেকে বের করে আগুন দিয়ে মনের সুখে টানতে টানতে বলল, অবশ্যই। কিন্তু ওদের সঙ্গে ঝগড়া হবে কেন! ভাগাভাগি করে রাত কাটালেই তো হয়।

এখানে বসে সেটাই অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম। এরাজ্যের লোকেরা ঘর ছেড়ে আসে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আরও রাজ্যের লোকেরা আসে একা।

কিন্তু মানুষের আদিম রিপু তো দেশ, জাত, ধর্ম কিছু মানতে চায় না, সেটাতো সঙ্গে নিয়ে আসে, দেশে রেখে আসেনা। তাই মাঝে মাঝে কেউ কেউ মেয়ে মানুষ ধরে টানাটানি করে, তখন আরম্ভ হয় প্রথম ক্ষেপের লড়াই। আবার এতকাল রাজ্যের রিক্সা, ঠেলা আর মোটরওয়ার একচেটিয়া আধিপত্য ছিল হিন্দীওলাদের, এখন বাজারে কমপিটিটর হয়ে দেখা দিয়েছে এরাজ্যেরমানুষ। এটা হল দ্বিতীয় ক্ষেপের লড়াই।

আর তৃতীয় ক্ষেপে?

সেটা সাম্প্রদায়িক। দক্ষিণ বাংলার মানুষের একটাই জাত। সে জাত হল গরীব জাত। রহমতের বিবি মিনতি মিস্ত্রী হলেও আপত্তি নেই। কিছুকাল রহমতের ঘর করে মিনতি ক্যাম্প বদল করে জোসেফ নস্করের আশ্রয় নিলেও তাতে মিনতির জাত ধর্ম নষ্ট হয় না। অনেক রাতে মিনতি যদি রসিক ঘরামির সঙ্গে ফিরে যায় নোকৃক্কিকান্তপুরের লাইনের কোন গ্রামে তখন তার পরিচয় হয় রসিক ঘরামির বউ। কিন্তু হিন্দীওলা হিন্দুরাও যেমন কট্টর তেমনি উর্দুওলা মুসলমানরাও কট্টর। তাই তৃতীয় ক্ষেপের লড়াই জাতধর্ম নিয়ে। তবে আরও ক্ষেপ আছে, সেটা মোটামুটি নিজেদের মধ্যে।

সনৎ চাটুজ্জে বলল, তুমি ভায়া দেখছি নৃতত্ত্ববিদ্।

আমি হাসলাম।

হাসছ কেন? বলেই বিড়িতে সুখ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল সনৎ চাটুজ্জে।

বললাম, আমি নৃতত্ত্ববিদ নই, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজখবর রাখি ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন কি কখনও। ওই যে মেয়েটা, ওর নাম সুন্দরী। হ্যা সুন্দরী তো বটেই, মোষের মত কালো, বেঁটে, কুঁত কুঁতে চোখ তবে কৈশোর ছেড়ে সবে পা দিয়েছে যৌবনে। জানেন তো মেয়ে কুকুরও সুন্দর হয় যৌবনে। যাকে বলে যৌবনে কুকুরী ধন্যা। সুন্দরীও ধন্যা। মেয়ে কুকুরের পেছন পেছন পুরুষ কুকুরগুলো কেমন ঘুরতে থাকে, মাঝে মাঝে প্রাপ্তির আশায় লড়াই করে। এই সব মানুষের জীবন সেই আদিমযুগের অবস্থা এখনও পেরোতে পারেনি। ওই সুন্দরীর পেছনে এতকাল যারা ঘুরছিল তাদের অবস্থা ঐসব পুরুষ কুকুরের মত। অবশেষে সুন্দরী বিয়ে করেছে রাখালকে, প্রতিযোগিতায় রাখাল সবাইকে পরাজিত করে সুন্দরীর পাশে শোবার অধিকার পেয়েছে।

তা হলে বিয়ে হয়নি।

হয়েছে সনৎদা। ওদের বিয়েতো আমাদের মত ব্যয় বহুল নয়। মালা এল, ফুল-সিঁদুর এল, চন্দন এল, নতুন শাড়ি এল। সব খরচই রাখালের। পণ দেবার অথবা নেবার হাঙ্গামা নেই। শরৎ চাটুজ্যের শ্রীকান্তে ডোমদের বিয়ের যে ছবি দেখেছ, এটাও সেই রকম। দশ বিশ জনের সামনে পরস্পরকে গ্রহণ করল, গরম গরম খিচুড়ি আর মাংসের ঝোল খেয়ে যে যার ক্যাম্পে ফিরে গেল। নতুন পলিথিনের ক্যাম্পে গিয়ে উঠল রাখাল আর সুন্দরী, ব্যস্। সমাজ গড়ল, সংসার গড়ল, যৌথ জীবন শুরু হল। বাইরে থেকে কেউ বাগড়া না দিলে প্রথম সন্তানের জননী হওয়া অবধি সুন্দরী নিশ্চিন্ত। তারপর যা কিছু ঘটে। জননী হওয়া মাত্র সুন্দরীর নজর থাকবে সন্তানের দিকে আর রাখালের নজর থাকবে অন্য কোন সুন্দরীর দিকে। এটাই স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম আছে। বিশ বছর ঘর করছে এই ফুটপাতের ক্যাম্পে এমন পরিবার বিরল নয়। চতুর্থ ক্ষেপের লড়াই এই বউ বদল ঘটনাটি স্বামী বদলের ধাক্কায়।

সনৎ চাটুজ্যে মাথা ঝুকিয়ে বলল, তুমি দেখছি ভায়া অনেক খবর জান।

জানি বললে ভুল হবে দাদা। তবে পথ চলতি অনেক কিছু চোখে পড়ে। অনেক কিছু শুনতে পাই। সে সব দিয়ে এই সব ফুটপাতের জমিদারদের করুণ জীবন চিত্র আমার মনে ধাক্কা দেয়। আজও ওদের লড়াই দেখে থেমে দাঁড়িয়েছিলাম। নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে ওদের বক্তব্য শুনছিলাম। এ থেকে যা মনে হয়েছে তাই বলছি। আগেও এদের কথা যেমন ভেবেছি আজও তেমনি ভাবছি আর মনে মনে একটা সমাজ ব্যবস্থার গঠন নিয়ে ভীত হয়ে উঠছি।

সনৎ চাটুজ্যে গম্ভীরভাবে বলল, এ রকম ফুটপাত বাসিন্দা অন্য দেশে আছে কি?

আছে। ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজরা যে সব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেইসব সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ সমূহের একই অবস্থা। ওরা যাবার সময় যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে গেছে তাদের পরিচয় কোন প্রগতির সন্ধান দেয়নি। ওরা শোষণ করেছে, ফিরে যাবার সময় দেশীয় শোষকদের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে গেছে। তাই শোষণের পরিণামে লক্ষ লক্ষ লোক কঙ্কালসার হয়ে এইভাবে বিভিন্ন দেশের ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এদের যেমন ঘর নেই, জীবিকা নেই তেমনি নেই নৈতিক কোন মান। কেউ কেউ ভালই উপার্জন করে অন্তত একটা ছাপোষা কেরাণীর চেয়ে ভাল উপার্জন করে কিন্তু দারিদ্র ওদের

ঘোচে না, সে শিক্ষা ওরা পায়নি। অর্জিত অর্থ জুয়া আর মদে শেষ করে প্রতিদিন সকালে নিঃস্ব হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে রুটি রুজির সন্ধানে।

সনৎ চাটুজ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আরেকটা বিড়িতে আগুন দিয়ে বলল, তোমার কথা শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ভায়া। ওসব প্রসঙ্গ থাক, এবার চলি।

হেসে বললাম, আমাদের মত সমাজ সচেতন মানুষ এর বেশি আর কি করতে পারে। পলায়নই আমাদের শেষ সম্বল।

সনৎ চাটুজ্যে উঠে যেতেই আমি রোয়াক ছেড়ে উঠে পড়লাম।

কিছু দূর এগোতে না এগোতেই সভ্যজগতের আয়াসলব্ধ জীবনের অন্যতম সঙ্গী একটি বাস বিকট আওয়াজ করে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেল গেল চিৎকার।

দাঁড়িয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম। বাসটাও দাঁড়িয়ে গেছে। যাত্রীরা তাকিয়ে দেখছে।

যাক্ বাঁচা গেছে! একেই বলে কপাল! ছেলেটার ডবল পরমায়ু।

না বেঁচে পারে, ভগবান বাঁচিয়েছে।

ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। এসেই পেলাম দাদামণির চিঠি। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রবীরকুমার খুবই অসুস্থ, জীবন-মরণ সমস্যা। পত্রপাঠ আমি যেন সেখানে যাই।

কাজের লোকটাকে বাড়ির চাবি দিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হলাম দাদামণির উদ্দেশ্যে।

রাত এগারটা নাগাদ পৌছে দেখলাম প্রবীরকুমার শয্যাশায়ী। রোগটা কি তা তখনও জানি না। প্রবীর জননী তার মাথার কাছে বসে অঝোরে অশ্রুপাত করছেন। আমাকে দেখে সরবে কেঁদে বললেন, ঠাকুরপো, এমন কোন অপরাধ তো করিনি যাতে ভগবান এই শাস্তি আমাকে দিচ্ছেন।

অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবছিলাম। মা অবোধ হতে পারে, তার পক্ষে কাঁদাটাও স্বাভাবিক কিন্তু এতে ভগবানের স্থান কোথায়, অপরাধের কথাই বা মনে হয় কেন। জীবনে মানুষ তো অনেক অপরাধ ঘটায় কিন্তু শাস্তি এড়িয়ে যায়, অথবা আইনের নাগালের বাইরে থাকে। তাদের জন্য ভগবানের হিসাবের খাতায় কি অপরাধগুলো পুণ্যকর্মের ফিরিস্তিজাত হয়ে থাকে, আবার চিরকাল শুদ্ধজীবন-যাপন করেও মানুষকে অকারণে শাস্তি ভোগ করতে হয় কেন?

কিন্তু বৌদিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। বার বার একই কথা বলতে থাকেন বৌদি। অতি মৃদুস্বরে বললাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে কতটা অপরাধ করেছিলেন তা কি বলতে পারেন? অথচ তাঁর মত পবিত্র মহাপুরুষের গলায় ক্যানসার কেন হয়েছিল? অপরাধ করলেই শাস্তি পায় না বৌদি। রোগটা দেহধর্মের ব্যভিচার থেকে হয়, আর ভগবান হল মন রাজ্যের সম্রাট। মন রাজ্যের সম্রাট কোন মতেই দেহ রাজ্যকে পরিচালিত করতে পারে না। আপনার কথায় মনে হচ্ছে পরাজিতের মনোভাব আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও দেহের ধর্ম মানতে হয়েছে, এমন কোন অলৌকিক ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করতে পারেন নি নিজেকে রোগমুক্ত করতে। বিবেকানন্দের মত অকল্পনায় প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিকেও অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছিল অথচ ভারতের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক মুক্তি সাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের আরও কিছুকাল বাঁচার প্রয়োজন ছিল। আপনি নিজের ছেলেটার কথাই ভাবছেন, বিশ্বজোড়া কত ছেলের মাকে কাঁদতে হচ্ছে সন্তান হারার বেদনায়।

বৌদি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

প্রবীর মরেনি। রোগের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে উঠেছিল। আমাকেও থাকতে হয়েছিল আরও কিছুকাল দাদামণির ডেরায়!

এবার ফেরার পালা।

বৌদি চোখ মুছে বললেন, ঠাকুরপো তুমি-ই আমার মনে শক্তি জুগিয়েছিলে। নইলে প্রবীরকে ফিরে পেতাম না।

বললাম, আমার এক বন্ধুর ছেলে ভাস্কর অসুস্থ। সবাই স্থির করেছিল, ছেলেটা বাঁচবে না। বন্ধুটি তার সন্তানের মাথায় হাত রেখে অনবরত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছিলেন। বন্ধুর ভাই বলল, আজ মন্ত্রে মানুষ বাঁচবে না দাদা, বিজ্ঞান মানুষকে বাঁচাবে। বলেই সে ছুটে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এল। চিকিৎসা হল। ছেলেটা বেঁচে উঠল। বিজ্ঞান তার জীবন দান করেছিল, মন্ত্র তা পারেনি। দেহযন্ত্র তো প্রকৃতির দাস, দেহ বিকল হবার উপক্রম হলে একমাত্র বিজ্ঞানই তাকে রক্ষা করতে পারে। তাই আপনাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেছিলাম মনের শক্তি ফিরিয়ে আনতে।

এরজন্য চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

আমার আর কিছু বলার ছিল না। সুটকেশটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের পথে। বলা বাহুল্য গাড়ি যথা সময়ে আসেনি। স্টেশনে বসে

ছিলাম। আমার মত বহুজন গাড়ির অপেক্ষা করছিল। তারা মাঝে মাঝে স্টেশন মাষ্টারের কাছে জানতে যাচ্ছিল, দশটার গাড়ি কটায় আসবে।

সামনের বেঞ্চে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে তার বয়স্কা কন্যা। পিতা ও কন্যা গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে ছিল একটা সুটকেশ।

আপের ট্রেন এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক পায়চারি করছিলেন মাঝে মাঝে। আপ ট্রেন আসতেই তিনি গিয়ে দাড়িয়ে রইলেন গাড়িটার পাশে। বোধহয় কোন পরিচিত জনের সাক্ষাৎ পাবেন আশা করছিলেন। আমার উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছিল একটি নব্য যুবক। তার কন্যা একা। কন্যাটিও বোধহয় তার বাবার প্রত্যাবর্তন আশা করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সামান্যক্ষণ! ইতিমধ্যে আপ ট্রেন হুইসিল দিয়ে রওনা হতেই সেই নব্যযুবকটি হঠাৎ ভদ্রলোকের সুটকেশটা নিয়ে ছুটে গেল ট্রেনের দিকে। মেয়েটা কিছু বুঝবার আগেই সুটকেশ হাতে করে নব্যযুবকটি ট্রেনে উঠে পড়ল, গাড়িটাও ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সৌভাগ্য ক্রমে প্ল্যাটফরম ছেড়েই গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল।

মেয়েটি যখন বুঝতে পারল তার সুটকেশ খোয়া গেছে তখন কাতর আর্তনাদ করে বাবাকে ডাকতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার বাবাকে আর দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে গাড়িটা থেমে যেতেই লোকজনের ছোটাছুটি আরম্ভ হল।

দেখলাম কন্যার পিতা নব্যযুবকের কলার চেপে ধরে নেমে আসছেন ট্রেন থেকে। তখনও সুটকেশটা যুবকের হাতে। ভদ্রলোক যুবককে সুটকেশ নিয়ে পালাতে দেখেই তার পেছন পেছন গাড়িতে লাফিয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য যাত্রীরা চোর পাকড়াও করতে সাহায্য করলেন। এরপর প্ল্যাটফরমে আরম্ভ হল হাটের মার। চোর বেচারির মুখচোখ ততক্ষণে ফুলে উঠেছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে।

পুলিশ এল।

আসামীকে নিয়ে গেল হাজতে।

এই হুজ্জতের মাঝেই এসে গেল ডাউন ট্রেন।

এবার সত্যি সত্যি যাত্রাপথ ধরলাম। পথে বার বার মনে হচ্ছিল এমন কাজটা কেন করল ওই নব্যযুবক। তার চেহারা দেখে কোন সময়েই

মনে হয়নি, স্যুটকেশ চুরি করার মতলব নিয়ে সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল।

ঘটনার গতি যদি পরিবর্তন না হত তা হলে অবশ্যই পরিণতি খুবই দুঃখজনক হত। গোলমালের মধ্যেই শোনা গেল ভদ্রলোকটির কন্যার বিয়ের গহনা ছিল ওই স্যুটকেশে।

বাড়ি ফিরে এসেও শান্তি নেই।

কাজের লোকটা এক গাদা চিঠি এনে রাখল টেবিলের উপর। একটা একটা করে চিঠিগুলো পড়তে পড়তে থামতে হল।

এরকম অনেক বারই থামতে হয়েছে।

সেদিন ভীড় দেখে দাঁড়াতে হল, থামতে হল ট্রাম লাইনের ধারে। এক গাদা নারী-পুরুষ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে, সামনে মস্ত বড় পরাত, দর্শকেরা পয়সা ছুঁড়ে মারছে একগাদা ফুলের উপর। সামনে মাটির পুতুল শনি দেবতার।

ভক্তির প্রাবল্যে অনেকের চোখে জল।

চোখে মুখে হতাশার ছাপ।

শনিতে পেয়েছে নিশ্চয়ই, 'দশ বিশ পয়সায় শনি মুক্তি যদি হয় এর চেয়ে অল্প মূল্যের আর কি থাকতে পারে। শনিঠাকুর নির্বিকার। মাটির পুতুলের বিকার হওয়া তো সম্ভব নয়। মানসিক বিকার ঘটেছে ভক্তদের। তারা যাচাই করতে ভুলে গেছে শনির পূজারীর তেজারতি কারবারের লাভ লোকসান। ভক্তদের কজন শনিমুক্ত হয়েছে তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবে পূজার উদ্যোক্তার শনিমুক্তি ঘটেছে। নতুন বাড়িঘর করে দিব্য সে সপ্তাহের আর ছয়টা দিন কাটাচ্ছে। ধর্মের নামে এমন বিকৃতি অন্য কোন দেশে আছে কিনা জানা নেই তবে ধর্মের নামে ব্যবসা পৃথিবীর সর্বত্র থাকলেও ভারতে এরই চরম চেহারা দেখা যায়।

হতাশা, ক্ষোভ, বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে চায় মানুষ। একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। মানুষের এই দুর্বলতাকে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে ধর্মের ব্যবসায়ীরা। সব মানুষই বাঁচতে চায় মানুষের মত। যখন পথ খোলা থাকে না তখন তারা যে সব পথ অবলম্বন করে তারই একটা হল ধর্মের আশ্রয়। অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধে তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অন্যের প্ররোচনায় আরও বঞ্চনার শিকার হয়।

আরেকটি পথ হল সমাজবিরোধিতা। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী মানব জন্মের সার্থক রূপায়ণ করতে চায়। সেখানেও তাদের থাকে ধর্মের আবরণ। সমাজবিরোধীরাও সব সময় ধর্মীয় উন্মাদনায় মেতে ওঠে ইহজগতের পাপের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পরজীবনকে পাপশূন্য করতে।

রাস্তা চলতে চলতে এইভাবে প্রায়শই থামতে হয়েছে।

আজ চিঠি পড়তে পড়তে থামতে হল।

কোন মহিলা অথবা পুরুষের চিঠি। হাতের লেখা দেখেও স্থির করতে পারছিলাম না, লেখক অথবা লেখিকা। নামটাও খুবই শ্রুতিমধুর। তীর্থরেণু হালদার। ভেবেই পাচ্ছিলাম না তীর্থ যদি পুরুষ হয় রেণু নিশ্চয়ই মহিলা। উভয়ের সমাহারে কি হতে পারে? টিউবজাত শিশুর মত অবস্থা। পিতৃ পরিচয় থাকে অজ্ঞাত, মাতৃ পরিচয় ধন্য হয়েও মায়ের আইন সম্মত স্বামীর সন্তান বলেই তার পরিচয়। আমি পড়েছি মহা সমস্যায়। নাম নিয়ে সমস্যা নয়, সমস্যা হল সশরীরে লেখক অথবা লেখিকা আসছেন ষোল তারিখে এবং আজই সেই ষোল তারিখ। আমার অনুপস্থিতিকালে চিঠি এসেছে। নিবৃত্ত করার মত সময় নেই। আজ যে কোন সময় হাজির হতে পারেন। কি বিপদ!

কাজের লোকটাকে বললাম, বাজার টাজার করেছিস।

হ্যাঁ দাদাবাবু।

চা চিনি বিস্কুট এসব আছে? না থাকলে বাদল মিস্ত্রিরের দোকান খোলা আছে কিনা দেখে আয়। অতিথি অভ্যাগত এলে আপ্যায়ন যেন ঠিক হয়।

সকালটা আশঙ্কা নিয়ে কাটল।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে কয়েকদিনের একগাদা সংবাদপত্র পাশে নিয়ে সবেমাত্র দু চারটে পাতা উল্টেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা।

কাজের লোকটা দরজা খুলে আগন্তুককে দেখে এসে বলল একজন দিদিমণি।

আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তীর্থরেণু আমার গৃহে কি কারণে তীর্থের পুণ্যফল অর্জন করতে এসেছেন ভেবে পেলাম না। শেষ অবধি আমাকে তীর্থ সলিলে অবগাহন যদি করায় তাতেও আশ্চর্য হব না।

ডেকে আনব দাদাবাবু?

বললাম, পাশের ওই ছোট্ট ঘরটায় বসা। আমি আসছি।

কাজের লোকটা বেরিয়ে গেল। আমিও গা মোড়া দিয়ে উঠলাম।

পাশের ঘরে ঢুকেই দেখলাম একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মধ্যবয়সী মহিলা বেশ মূল্যবান একটা ছাপা শাড়ি পরণে বসে আছেন জানালার দিকে মুখ করে।

আমি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করলাম, বললাম, নমস্কার।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। বললেন, আমার চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

আপনার চিঠি? কি নাম আপনার?

আমার নাম তীর্থরেণু হালদার। বলেই চেয়ারে বসে হেসে বললেন, আমার বাবা-মা তীর্থ করতে বেরিয়ে ছিলেন। মাদুরায় হাসপাতালে আমার জন্ম। তীর্থে জন্ম তাই আমাকে বাবা-মা ডাকতেন তীর্থ বলে। তবে নামটায় পুরুষালি ভাব রয়েছে। তাকে নারীত্ব দান করতে রেণুটা জুড়ে দিলেন দাদামশায়। আমিও দুটো নাম পেয়ে খুশী। তবে অচেনা লোক অনেক সময় ভুল করে থাকে। তা কি করব বলুন, নাম চিরকালই নাম। অর্থাৎ একটা আইডেনটিটি, নাম যদি তীর্থরেণু না হয়ে হৈমীরানী হত তা হলে কি আমি বদলে যেতাম।

অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। ভদ্রমহিলার কণ্ঠে সরস্বতী এভাবে আশ্রয় নেবেন তা ভাবতে পারিনি। তবে উনি লক্ষ্য করলেন আমি নির্বাক। হঠাৎ থেমে বললেন, আপনি কথা বলছেন না কেন?

বললাম, বলবার অবসর পেলাম কোথায়? যাই হোক অনেক দূর থেকে কলকাতায় এসেছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দিনক্ষণ যখন ঠিক করে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটাই বলুন।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ঠিক। তবে নিজের পরিচয়টা সংক্ষেপে না দিলে আপনিই বা কেন আমার সঙ্গে হাত মেলাবেন। জটিল বিষয়। জটিলতার জাল ছিঁড়তে হবে। তাই আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। মাপ করবেন, অনেক কিছু বললাম, কিন্তু আসল ঘটনার ধারে কাছেও যাই নি। তবে প্রথমে আপনাকে বলতে হবে, আমার সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

তীর্থরেণু আমাকে তখন পর্যন্ত কিছুই বলেন নি অথচ প্রতিশ্রুতি চান অজ্ঞাত বিষয়ে তাঁর হাতে হাত মেলাতে, খুব বাক্‌পটু তো বটেই উপরন্তু বিশেষ চতুর মহিলা বলেই মনে হল।

বললাম, বলুন আমি কি ভাবে সহযোগিতা করতে পারি।

তা হলে একটু পেছন থেকে কথাটা আরম্ভ করি। আমার বাবা ছিলেন স্বদেশী করা লোক। মা ছিলেন রাঁধুনী বামুনের মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়েছিল কবে কি ভাবে তা কেউ জানে না, বোধহয় কালীঘাটের পাণ্ডারা অথবা দালালরা বলতে পারেন। লোকে বলল, এ বিয়ে সিদ্ধ নয়। বাবা-মা লোকের কথায় কান দিতেন না। তারা ঘর বাঁধলেন উত্তর বাংলার ছোট্ট একটা শহরে। জেলখানায় বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির। তাদের সহযোগিতায় বাবা কাজ পেলেন মুদির দোকানে খাতা লেখার।

ঠিক এই সময়ই আরম্ভ হল ভারত ছাড় আন্দোলন। বাবা মাকে একা রেখে আবার গেলেন জেলে। তখন আমরা কেউ জন্মাইনি।

বাবা জেল থেকে ফিরে এলেন পঁয়তাল্লিশ সালে, আমার জন্ম সাতচল্লিশে ঠিক দেশ স্বাধীন হবার কয়েক মাস আগে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখে বাবা মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেখানেই আমার জন্ম।

দেশ স্বাধীন হবার পর বাবা বেশ জাঁকিয়ে বসলেন সমাজে। সরকারী চাকরি পেলেন, কিন্তু সহ্য হল না। চিরকাল মাঠে ঘাটে যিনি ইংরেজ তাড়াবার বক্তৃতা দিয়েছেন, গোঠছাড়া গরুর মত মাঠে ঘাটে ঘুরেছেন। চাকরির বন্ধন তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। তাই চাকরি ছেড়ে দেশ সেবায় তথা দল সেবায় নেমে পড়লেন। সরকারী চাকুরে না হলেও সরকারী বিশেষ বিশেষ সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে বেশ কিছু পয়সার মুখও দেখলেন।

কিন্তু বিধি বাম।

কলকাতায় গিয়েছিলেন মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হয়েছিল কিনা জানি না। তবে কলকাতা থেকে ফিরে এসে কেমন উদাস হয়ে পড়েছিলেন।

মাঝে মাঝেই বাবা বলতেন, বিচিত্র এই দেশ।

মা জিজ্ঞেস করলে অনেক ঘটনা বলতেন। তার মধ্যে হিমাংশু করের ঘটনাটাই বড় বেশি ব্যথিত করেছিল বাবাকে। হিমাংশু বাবার সঙ্গে জেলে ছিল তবে স্বদেশী করে নয়। হিমাংশু ছিল নারী ধর্ষণের আসামী অথচ স্বাধীন ভারতে হিমাংশু হয়েছে উঁচুদরের দেশসেবী।

বললাম, রেণুদেবী সমাজের রূপ বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তা বটে। বলেই তীর্থরেণু ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা সিগারেট বাঁ হাতের দু আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিতেই বললাম, মাপ করবেন। সিগারেট আমি খাই না।

একটু বিমর্ষভাবে তীর্থরেণু বলল, আমি খেলে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আপত্তি করার তো আমার অধিকার নেই, অসুবিধাটা বলতে পারি। তামাকের গন্ধ আমার সহ্য হয় না, এটাই বলতে পারি।

মেয়েদের সিগারেট খাওয়া আপনি পছন্দ করেন না বুঝি?

গম্ভীরভাবে বললাম, মেয়ে পুরুষ কারও সিগারেট খাওয়া আমার রুচি বিরুদ্ধ।

কারণ?

স্বাস্থ্য সম্মত নয়। যাক্ ওসব কথা, আপনার বাবার কথা বলুন। সিগারেট টানার কেচ্ছা অনেক দূর গড়াবে। ' আপনি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলবেন। আমি বলব অধিকারের অপব্যবহার মোটেই অধিকারের মর্যাদা দেয় না। অধিকার অধিকার করে চিৎকার করলে আভিজাত্য প্রমাণিত হয়, যে আভিজাত্যের বাহিরের চেহারা বেশ মোলায়েম হলেও ভেতরে সবটাই ফাঁকা। আভিজাত্য সম্বন্ধে এই সব মেকি অভিজাতকের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

আপনি মেয়েদের খুবই ছোট চোখে দেখেন।

না।

আপনি দেখছেন আজকাল খেলাধূলা থেকে আরম্ভ করে জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা এগিয়ে গেছে।

তারজন্য আমি তাদের প্রশংসা করি। কিন্তু এই কথা বলতে অথবা শুনতে তো আপনি আসেন নি। যে কথা বলছিলেন সেই কথাই বলুন। হিমাংশুকে দেখেই আপনার বাবার মতবাদ নিশ্চয়ই বদলে গিয়েছিল।

হাঁ। যারা ক্রিমিন্যাল, যাদের পূর্ব ইতিহাস কলঙ্কিত তাদের যখন দেখলেন ক্ষমতার শিখরে তখন স্বাভাবিক কারণেই তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন। উদাসীনতা সেই কারণেই।

যাদের দেখে উনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাদের কথা বিশেষভাবে উনি চিন্তা করেননি। মনে করুন এখন তো সরকার পরিচালনা করছে কোন না কোন দল। তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ নানা আন্দোলনের মাঝ দিয়ে নিজেদের দাবী আদায়ের চেষ্টা করে থাকে। এই তো কিছুকাল আগে বাস ভাড়ার প্রতিবাদে একটি দল পথে নেমে পড়ল। তারা পুলিশের লাঠিতে আহত হল। শাসক দলের ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে নির্যাতিত হল। তারপর বাসভাড়া কমল। যারা

নির্যাতন সহ্য করল কেবলমাত্র তারাই বাসে চলাচল করছে না। যারা নির্যাতন করেছে, যারা দর্শক মাত্র ছিল তারাও চলাচল করছে। অর্থাৎ যারা দেশের ও দশের উপকারে আত্মোৎসর্গ করে তারা মহান কিন্তু যারা এর পরিপন্থী তারা কিন্তু এই মহান ব্যক্তিদের মহান অবদানের অংশ লাভ করে, তারা অতি চতুর এবং আত্মসর্বস্ব, যেজন্য বিনা মেহনতে মহান ব্যক্তিদের কষ্টার্জিত সুফল ভোগ করে আর মহান ব্যক্তিরা চিরকাল বাস্তববিচারে বঞ্চিত হয়ে থাকে। আপনার বাবা কিন্তু ব্যতিক্রম নন।

তীর্থরেণু অবাক হয়ে আমার কথা শুনছিল। হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, আপনার যুক্তি অস্বীকার করছি না কিন্তু আদর্শের মৃত্যু দেখলে আদর্শবান ব্যক্তি মাত্রই ব্যথিত হয়, আমার বাবাও তাই হয়েছিলেন।

আমরা ভিক্ষা করে স্বাধীনতা পেয়েছি। যদি বুকের রক্ত দিতে হত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তা হলে দেশের চিত্র অন্যরূপ হত। তারপর বলুন।

বাবা আমাদের রেখে সন্ন্যাস নিলেন। সন্ন্যাস জীবনে আশ্রম গড়লেন। বহু ভক্ত ও শিষ্যের আমদানী হল। আর আমদানী হল অজস্র মুদ্রা।

চমকে উঠলাম।

তীর্থরেণু আবার বললেন, বাবা যা করতেন তা আমার রুচির বাইরে। তাই একদিন বলেছিলাম, জানো বাবা তিন হাজার বছর আগে সব কৃশ্চানই হিন্দু ছিল। বাবা অবাক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মানে?—বললাম অতি সহজ এর মানে।

বাবা অনেকক্ষণ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা ধর্ম কর্ম করি এজেন্টের মারফত। ধরুন আপনি হলেন ভক্ত শিষ্যদের এজেন্ট। ঈশ্বরের পদদর্শন করতে হলে গুরু সেবা সর্বপ্রথম। সেই গুরু দেখাবেন ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ। আপনার কিছু করার নেই। গুরু অর্থাৎ এজেন্ট সাহেব আপনাকে ভগবানের দরজা অবধি পৌঁছে দেবে? নয় কি?

বাবার ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তবুও থামলাম না। বললাম, ধরুন বাড়িতে কালীপূজা করবেন। আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করলেন কিন্তু আপনার পূজা করার অধিকার নেই। তার জন্য আপনার এজেন্ট হল পুরুতমশায়। এই পুরুতমশায় শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক আপনার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দেবার সুপারিশ করলেন। নয় কি?

বাবা রেগে মেগে বললেন, থাম হারামজাদী।

বললাম, ঠিক বলেছেন আপনি। আমি হারামের জাদী। তার অর্থ আপনি নিজেই বোঝেন। কৃশ্চান ইংরেজরাও তাদের কর্মসিদ্ধির জন্য এজেন্টের আশ্রয় নিয়েছে চিরকাল। সম্রাট থাকতেন বিলাতে। তার এজেন্ট ভাইসরয়, আবার ভাইসরয় গোটা দেশে এজেন্ট ছড়িয়ে রেখে শাসন শোষণ কাজ করে এসেছে। এই এজেন্সীর শিক্ষাটা আমাদের কাছ থেকেই পেয়েছে কৃশ্চানরা। তাই বলছি, কৃশ্চানরা তিন হাজার বছর আগে হিন্দু ছিল। ঈশ্বরের পুত্র আসার পর তাদের ধর্মমত বদলালেও, কর্মধারার কোন পরিবর্তন হয়নি আজও। মুসলমানদের ব্যবস্থা বরং প্রশংসনীয়। আল্লাহ আছেন কিনা তা বিতর্কিত কিন্তু তাদের কোন এজেন্ট দরকার হয় না। এইটেই তাদের সৌভাগ্য। ঈশ্বর আর মানুষের মাঝে কোন এজেন্ট থাকতে পারে তা বিশ্বাস করে না মুসলমানরা।

বাবা আমাকে সহ্য করতে পারলেন না। বিদায় করে দিলেন আশ্রম থেকে।

বললাম, আপনার বাবা নিশ্চয়ই ভক্তিমার্গের উচ্চ সোপানে পেঁছেছেন।

ছাই। লোক ঠকিয়ে খাওয়াই তাঁর ব্যবসা।

বললাম, আদর্শ।

আদর্শ আর নেই। কাউকে মাদুলি দিচ্ছেন, কাউকে হাত দেখে বলছেন তার ভবিষ্যত: এ সবই ভুয়ো এবং মিথ্যা। অথচ তাঁর বাড়িতে বসে এই অনাচার সহ্য করতে পারছিলাম না। ভক্তরা বাবা-বাবা বলে পাগল। বাবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

বললাম, কিন্তু নিজেদের জন্মদাতা বাবাকে এক মুঠো ভাত দিতে হলে ওদের বুক ফাটে কিন্তু পাতানো বাবার সুখের জন্য কত না ত্যাগ স্বীকার করে। এই বাবাজি, মাতাজি, দাদাজীর দল কিভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে তার তো হাজারো দৃষ্টান্ত আছে। তারপর বলুন আপনার কথা। তবে শুনেছি অনেক বিপ্লবী শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের সন্ন্যাস ছিল ব্যক্তিগত আত্মোন্নতির।

তীর্থরেণু বলল, বাহ্যত তাই ভেবেছি। তবে বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি, আত্মোন্নতিও স্বার্থপরতার একটা ছদ্মরূপ। বঞ্চিত জীবনকে লাভজনক পেশায় আনতে হলে বঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয় এটাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সব

সাধু সন্ন্যাসীর ভেক্‌ধারীরা নারী ধর্ষণ, জালিয়াতি, অপহরণ, হরণ প্রভৃতি সব কাজই অনেক সময় করে থাকে, এর সঠিক হিসাব জমা না থাকলেও মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দু চারটে যে সংবাদ বের হয় তাই যথেষ্ট।

অতীতে রাজ অনুগ্রহে ধর্মের প্রসার ঘটেছে। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের বেনো জল ঢুকলেও সেদিকে কেউ লক্ষ্য করেনি। এর ফলে পাপাচার পরবর্তী যুগে আরও ব্যাপক হবার সুযোগ পেয়েছে।

এবার আপনার কথা বলুন।

বাবার কাছ থেকে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে দাঁড়ালাম পথে। বয়স কম, শিক্ষা দীক্ষাও এমন কিছু নয় তাই চিন্তায় পড়লাম। বাবার কাছে যারা যেত তারা খুঁজতো পার্থিব লাভের পথ আর মুক্তির পথ। আমি পথে এসে দাঁড়িয়ে খুঁজতে থাকি মুক্তির পথ। এ মুক্তি কিন্তু আত্মার মুক্তি নয়। এ মুক্তি হল বাঁচার জন্য পরিবেশের কুৎসিত আঘাত থেকে মুক্তি। সেই মুক্তির সন্ধানে আপনার কাছে এসেছি। এতদিন যে সব পথ অবলম্বন করেছিলাম, তা বোধ হয় সঠিক পথ নয়।

আমার কান চোখ মুখ গরম হয়ে উঠল তীর্থরেণুর আবদার শুনে। অন্ধকে চোখের উপযোগিতা বুঝাবার দায়িত্ব পালন করা কি সহজ কাজ। সারা জীবন যে ব্যক্তি পার্থিব জটিলতার শিকার হয়ে কলুর বলদের মত ঘুরপাক খাচ্ছে তাকে বলা হল পথ নির্দেশ করতে। সে তো একটাই পথ চেনে। অতি পুরাতন পথে যে বার বার পাক খায় তার দ্বিতীয় কোন পথ জানা নেই।

অনেকক্ষণ ভেবে বললাম, বড়ই বিপাকে ফেলছেন। আপনি নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করেন, প্রগতি তার আভিজাত্যের দাবীদার। অথচ আমার মত একটা হতভাগাকে পথ নির্দেশক কেন মনে করলেন সেইটাই ভাবছি।

তীর্থরেণু বলল, আজই, এখনই বলতে হবে একথা বলিনি।

তাও ঠিক কিন্তু এজেন্ট দিয়ে কোন কাজ হয় কি?

পথ যে দেখায় সেও কি এজেন্ট।

পথ প্রদর্শক হল গুরু, আর গুরু হল জ্ঞানদানের এজেন্ট। নিজেকে অত ছোট ভাবছেন কেন, মুক্তির সন্ধান আপনিই পেয়ে যাবেন আত্ম জিজ্ঞাসার মাঝ দিয়ে। মন্দিরে দেবতার মূর্তি থাকে। বিধর্মীরা এসে তা ভেঙ্গে দেয়। মাটি বা পাথরের দেবতা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না অথচ তাকেই আমরা মনে

করি আমাদের সাহায্য ও রক্ষক। মাটি বা পাথরের দেব দেবীর প্রতিমার রক্ষক হল মানুষ, মানুষই তার নিজের মত করে রূপ দিয়েছে, দেবতার গুণ দিয়েছে, স্তুতি করেছে। সেই মানুষকেই বাদ দিয়ে আমরা দেব মন্দিরে যাই। আপনিও বোধহয় ভুল আবার করছেন। ফলে দেবতা অথবা পথপ্রদর্শক মনে করে এসেছেন, তার নিজেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হলে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। আপনি মানুষ, আপনার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার করুন, পথ আপনিই খুলে যাবে। আত্ম জিজ্ঞাসা হল বড় পথ।

তীর্থরেণু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আপনাকে বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন। তবে মাঝে মাঝেই আসব। বিরক্ত হলেও ক্ষমা করবেন নিজ গুণে।

তীর্থরেণু বিদায় হতেই খবরের কাগজ খুলে বসলাম।

আশ্চর্য ঘটনা।

বাইশটা খুনের দাবীদার ছিল বিহার রাজ্যের এক প্রাক্তন বিধায়ক। এই খুনীকে প্রাণ দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষের হাতে।

ইনি কংগ্রেস কর্মী ও কংগ্রেসের বেশ একজন নামী নেতা। এঁর গুলিতে যারা প্রাণ দিয়েছে তারা অন্ত্যজ শ্রেণীর হরিজন। এই সব হরিজনদের জমি দখল তো করেই ছিল, উপরন্তু এদের ঘরবাড়িতে আগুন দিয়ে, নারীদের অমর্যাদা করে কংগ্রেসের পক্ষপুটে বাস করে এতকাল যে জনসমাজে নিরাপদে ঘুরে বেরিয়েছে, এটাই আশ্চর্য!

আমাদের শশধর পোড়েল বলেছিল, ষোল কলা পূর্ণ না হলে তো দণ্ডলাভ হয় না।

জেলখানায় খলিলুর বলেছিল, বলার কিছু নেই কর্তা। দশদিন চোরের একদিন গেরস্তের। আল্লার দরবারে হাজিরা দেবার আগেই আসামীর দণ্ড হয় এই দুনিয়াতে।

শশধর আর খলিল দুজনেই বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন দার্শনিক।

এর চেয়ে খাঁটি কথা বলেছিলেন আমাদের পাড়ার তর্কতীর্থ মশায়। তিনি বলেছিলেন, রাবণ বধ সহজে হত কি? সীতার সতীত্ব রক্ষা তো ছেলে খেলা নয়। রাবণের পাপের যখন ষোল কলা পূর্ণ হতে সামান্য বাকি এমন সময় স্বর্গজয় করলেন লঙ্কার অধীশ্বর। দেবরাজ ইন্দ্র সসৈন্যে এবং পাটরানী শচীকে নিয়ে আত্মগোপন করলেন। স্বর্গ দেবতাশূন্য হলে তো সেটা আর স্বর্গ থাকে না। প্রজাই যদি না থাকে রাজা রাজত্ব করবে কিসের আশায়। তাই স্বর্গের

সাধারণ নাগরিকরা থেকে গেলেন স্বর্গে।

শ্রোতারা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ তাতো ঠিকই। তারপর পণ্ডিতমশাই?

তারপর রাবণ কুঁদে বেড়ায় স্বর্গের পথে পথে। বিশেষ করে রাতের বেলায় উর্বশী মেনকার সন্ধানে বের হয়। সেটা ছিল পূর্ণিমা রাত্রি। স্বর্গের রাস্তা-ঘাটগুলো চাঁদের আলোয় আলোময়। রাবণও বেরিয়েছেন শিকারের খোঁজে। হঠাৎ চোখে পড়ল, চাঁদের আলোকে হার মানিয়ে আরও আলোর জেল্লা তুলে একটা যুবতী রাস্তা দিয়ে চলছে। রাবণ ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বলল, কে তুমি?

মেয়েটা বলল, আমি রম্ভা। আর আপনি কে?

রাবণ বলল, আমি ত্রিভুবনের রাজা রাবণ।

শুনেই রম্ভা গড় হয়ে প্রণাম করল রাবণকে। বলল, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ।

রাবণ বলল, কোন ভ্রাতার বধূমাতা?

ধনপতি কুবের আপনার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমি তারই পুত্রবধূ অর্থাৎ আপনারও পুত্রবধূ।

রাবণ তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। রম্ভাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। তার পরের ঘটনা রামায়ণে রয়েছে। তবে কুবের পুত্র অভিশাপ দিলেন, ভবিষ্যতে কোন দিন রাবণ যদি শক্তি প্রয়োগ করে কোন অনিচ্ছুক রমণীর সহবাস করে তখনই রাবণের মৃত্যু ঘটবে। বাস্। ষোলকলা পূর্ণ। সীতার সতীত্ব রক্ষা হোল, আবার রাবণও মৃত্যুদণ্ড পেল।

শশধর, খালল, আর তর্কতীর্থমশায় যা বলেছিলেন বিহারের সেই প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুও ঘটেছিল ষোলকলা পূর্ণ হতেই।

কিন্তু প্রাক্তন বিধায়ক তো অন্যায় কিছু করেনি। নরহত্যা?—ক্ষমতা থাকলে এবং তা রক্ষা করতে হলে দুর্বলকে হত্যা করা তো পৃথিবীর সবদেশেই আইন সম্মত। যতদিন হিটলার ক্ষমতায় ছিল ততদিন তার সব কাজই তো আইন সম্মত মনে করত তার দেশের মানুষ। অবশ্য হিটলার ক্ষমতা হারিয়ে আত্মহত্যা করার পর তার সব কাজই বে-আইনী বলে সবাই জানল। গ্যাস চেম্বারে লক্ষ লক্ষ ইহুদী হত্যা করে, বহু দেশ ধ্বংস করে তবেই তার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু উল্টোটাও হতে পারত যদি হিটলার পরাজিত না হত।

প্রাক্তন বিধায়ক বাহাদুর সিংহের বাহাদুরিকে কেউ সাহস করে নিন্দা

করেনি। হঠাৎ আততায়ীর গুলিতে তার মৃত্যু ঘটায় সবাই তার গুণের চেয়ে দোষের অংশ বেশি করে দেখছে।

আর ধর্ষণ? সেটা তো কোন দেশেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকাল আমরা কিছুটা সভ্য হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ষিতা স্ত্রীর মর্যাদাও পায়।

খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছি। পাশেই ছিল সাময়িক পত্রিকা। খুলে দেখলাম।

হ্যাঁ কাজের মত কাজ করেছে ভারতের খেলোয়াড়রা। পুরনো দিনের সাময়িক পত্রিকাটা সেই সব খেলায় বিবরণ দিয়েছে যে সব খেলায় ভারত জয়লাভ করেছিল।

মেজমাসী খেলা খুব ভালবাসেন।

সকালবেলায় খবরের কাগজ আসা মাত্র খেলার খবরটা আগে পড়েন। নিজে পড়েই ক্ষান্ত হন না সবাইকে সবিস্তারে খেলার খবর শোনান। কখনও কখনও বেশ উত্তেজিত হয়ে কারও প্রশংসা করেন, কারও নিন্দাও করেন।

টেলিভিশনের পর্দায় খেলা দেখতে বসলে স্নান খাওয়ার কথাও ভুলে যায় মেজমাসী।

গোবেচারা শ্যামুমেসো মেজমাসীর খেলা দেখার খরচ জোগান। কষ্ট করেও একটা টেলিভিশান সেট সংগ্রহ করেছেন। কখনও কখনও ছুটির দিন শ্যামু-মেসোও মেজমাসীর পাশে বসে খেলা দেখেন। খেলাটা অত বোঝেন না তবে ক্রিকেট খেলায় যখন কেউ আউট হয় আর মেজমাসী আউট বলে চিৎকার করেন তখন শ্যামুমেসো হুঁস ফিরে পান। একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান একবার টেলিভিশনের সেটের দিকে তাকান আরেকবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে চান কোন পক্ষ আউট হল।

এই মেজমাসীই বারবার বলেছে একদিনের খেলায় ভারত হল চ্যাম্পিয়ান।

শ্যামুমেসো বলেছে, অবশ্যই।

কিন্তু শারজার খেলায় ভারত যখন গোনঠাস তখন মেজমাসী বলল, ওদের কেন খেলতে পাঠায়। যারা খেলতে নামে তারা খেলতে পারুক আর না পারুক পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ঘরে ফিরবে কিন্তু দেশের মান রক্ষার গরজ তাদের নেই। থাকবেই বা কেন। সম্পর্ক তো টাকা। তাতো পেয়েছে, আর!

শ্যামুমেসো জিজ্ঞেস করে, আর কি?

মদ গো মদ। মদ খেয়ে ওরা ভারতের নাম ডোবালো।

শ্যামুমেসো বলল, মদ তো ভাল জিনিস।

ছাই। সব কর্ম ক্ষমতা নষ্ট করে। বিবেক বুদ্ধি হারায়, অমানুষ হয়।

শ্যামুমেসো বলল, ঠিক বলেছ গিন্নি। মানুষ সত্যিই অমানুষ হয় কিন্তু আমাদের মুনিঋষিরাও মানুষ ছিলেন। তাঁরা কারণ সেবন করলেও অমানুষ হননি। তাঁরা কতশত মহাকাব্য, কাব্য রচনা করে গেছেন যা আজকের দিনে সাহিত্যে, কৃষ্টিতে অমূল্য সম্পদ। ওসব না লিখে গেলে ভারতবর্ষকে কেউ চিনতোই না।

ছাইপাশ লিখে গেছে। পড়লে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। আসবসেবী মুনিঋষি না হলে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মবৃত্তান্ত অমন ভাবে কেউ লিখতে পারত। মা কুন্তী? তার একপুত্র সূর্যের সন্তান, একপুত্র ধর্মের সন্তান, একপুত্র পবনের সন্তান, আরেক পুত্র ইন্দ্রের সন্তান, আর রেকভেড্ হাসবেণ্ড হল পাণ্ডু। অর্থাৎ কুন্তীর পঞ্চপতি। আজকের দিনে একথা ভাবতে পার? এরকম নারীকে তোমরা তো রেডলাইট এরিয়াতে নিয়ে গিয়ে বসাতে। আর যদি তালাকি বিবি হত তা হলে আর বলার কিছু নেই, অন্তত আইনে সে সুবিধা দেয়নি। সবই সেই আসব সেবন জনিত। আসব সেবনই ভারতীয় অল্পবয়সী খেলোয়াড়দের সর্বনাশ করেছে।

শ্যামুমেসো বলেছিল, আশ্চর্য! সুরাপান দেবলোকে চিরকাল ছিল। বোধহয় এখনও আছে। সুরা পান করত বলেই তো দেবতাদের সুর বলা হয়।

মেস্তমাসা রেগে বলল, ঠাট্টা কর না। দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা ভাল নয়।

গোবেচারী শ্যামুমেশো ধমক খেয়ে থমকে গিয়েছিল।

আজ খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে মেস্তমাসার কথাগুলো মনে পড়ছিল। বীরবাহাদুর একস্ এম-এল-এ, লঙ্কাধিপতি রাবণ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি কি পড়ছিলাম তা জানি না, তবে বার বার মনে হচ্ছিল, এসব কিছুই পুরনো জিনিস নতুনভাবে চোখের সামনে এসেছে। শ্যামুমেসো সুরাসেবীদের সুরের সম্মান দিলেও কার্যক্ষেত্রে তারা অসুরকেও বোধহয় হার মানায়। নইলে বোম্বাইয়া মন্ত্রী আর বিহারী প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক অঘটন ঘটাতে পারতো কি!

কাগজ খাতাপত্র সামনে রেখে ভাবছিলাম। বোধহয় ধ্যানস্থ হয়েছিলাম, ধ্যান ভঙ্গ করল কাজের লোকটা। কিন্তু কল্পনা রাজ্যে তখনও

বিরাজ করছিলাম। কাজের লোককে মনে হল হিমালয় দুহিতা পার্বতী আর নিজেকে মনে করছিলাম স্বয়ং দেবাদিদেব। কিন্তু!

কিন্তু মনে হল কারণ, সেই কামদেবের অভাব। শর নিক্ষেপ কেউ করল না। অতএব বাস্তবে ফিরে এলাম। সুন্দরী পার্বতীর স্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠখোট্টা জগঝম্পরাম।

চা আনব দাদাবাবু?

চোখ মুছে কাজের লোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, অবশ্যই। তবে অভ্যাগতদের দরজা পেরোতি দিস্ না যেন। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বুঝলি!

॥ পাঁচ ॥

তীর্থরেণুর সমস্যা মিটেছিল কিনা জানিনা। ছবিরণের সমস্যা মেটাতে গিয়ে হিম্‌সিম খেতে হয়েছে। ছবিরণ পাশের বাড়ির বিকাশবাবুর দাসী। ওদের ভাষায় বাঁদী। সমস্যাটা বড়ই জটিল। বিকাশবাবুর খোট্টা পাচক মুসলমানী দেখেই স্থির করেছিল, হিঁয়া কাম নেহি করে গা।

ছবিরণ জিজ্ঞেস করেছিল, কাহে ঠাকুরজি?

তু মুসলমান, তেরা পানি ভি অচ্ছুৎ।

বিকাশবাবুর বিপদ। এতকাল গিন্নী ছিলেন, সংসার সামলাতেন কিন্তু সম্প্রতি তিনি গতায়ু। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাজের মেয়ে ছবিরণ সংসারের কিছু দায় নিলেও ভেতর বাড়ির অর্থাৎ রান্নাঘরের চার্জ নেবার লোকের বড়ই অভাব। তাই পাচক রেখেছিলেন। কিন্তু বিপদ হল ছবিরণকে নিয়ে।

ছবিরণ বলেছিল, বাবু যদি মেনে নেন তা হলে আমিই রান্না করে দেব।

বিকাশবাবু বলেছিলেন, আমার তো আপত্তি নেই তবে পাড়া প্রতিবেশী যদি সহ্য না করে তা হলে একটা হাঙ্গামা হবে।

আজকাল সবাই তো মুসলমানের বড় বড় হোটেলে সপরিবারে খেয়ে আসে।

বিকাশবাবু হেসে বলল, নো বিফ্ সাইন বোর্ড থাকে।

ছবিরণ কিছু না বুঝেই বলেছিল, একটা কাগজে নো বিফ্ লিখে রসুই-খানায় টাঙ্গিয়ে দিন।

বিকাশবাবু অবাক হয়ে তার কথা শুনলেন, কোন উত্তর দিতে পারেননি তবুও ছবিরণকে রান্নার চার্জ না দিয়ে বিহারী তেওয়ারীকে নিযুক্ত করেছিলেন।

তেওয়ারী বেশ কাজ করছিল কিন্তু যেদিন শুনল ছবিরণ মুসলমান সেদিন-ই সে বিগড়ে গেল। বিকাশবাবু নিরুপায় হয়ে তেওয়ারীর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন পাঁচশ টাকা।

শাস্ত্রে নাকি আছে কাঞ্চনমূল্যে সব পাপ খণ্ডন হয়। এই শাস্ত্রবাক্য অনুধাবন করে তেওয়ারী রয়ে গেল বিকাশ বাবুর বাড়িতে। মনে মনে স্থির করল, দেশে ফেরার আগে গঙ্গা স্নান করে পাপমুক্ত হবে।

তেওয়ারী পাচক। ছবি সাহায্যকারী।

আর বিকাশবাবু তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেরা বড় হয়েছে, স্কুল কলেজের পড়া শেষ করে সবাই নিজের নিজের কর্মস্থলে চলে গেছে। অন্দরের খবর রাখার কোন দরকার হয়নি, শুধুমাত্র কাজের ছেলেটা বাড়ির খরচ চাইলে টাকা দিয়েই বিকাশবাবু খালাস।

একদিন সকালে কাজের ছেলেটা এসে বলল, তেওয়ারী আর ছবিরণ ঘরে নেই। কোথাও তারা চলে গেছে।

মহা বিপদ। বিকাশবাবু হম্বিতম্বি করলেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না।

ছবিরণ আর তেওয়ারী চলে যাবার পর দেড়টা বছর কেটে গেছে। বিকাশবাবু ভুলেই গেছেন তাদের কথা। একদিন সকালে বসে বসে কাজ করছেন এমন সময় শিশুর ক্রন্দন তার কানে পৌঁছানো মাত্র সজাগ হলেন। কাজের ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে কে কাঁদে ?

আজ্ঞে ছবির ছেলে।

ছবির ছেলে ! কোন ছবি ?

আজ্ঞে, যে মেয়েটা ঘরের কাজ করত সেই ছবি। ছবিরণ, বাবু।

এর মধ্যে ছবিরণ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

বিকাশবাবু মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর ছবিরণ

এলুম আপনার চরণ দর্শন করতে।

এতদিন কোথায় ছিলে ?

আর বলবেন না বাবু। নসীবের ফের। তাই চক্কর খেয়ে ঘুরছিলাম।

আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তেওয়ারী কোথায় ?

পালিয়েছে। অনেকদিন ধরেই খুঁজছি। দেশের যে ঠিকানা দিয়েছিল

সেখানেও গিয়েছিলাম। ওই গ্রামে একঘর তেওয়ারীও নেই। বড্ড ধোঁকাবাজ।

বিকাশবাবু কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। ছবি অথবা তেওয়ারী তাঁর জীবনে কোন সমস্যাই নয় অথচ তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

ছবি মেঝেতে পা ছড়িয়ে যা বলল তার গলিতার্থ হল : ছবিরণকে মুসলমান জেনে যে তেওয়ারী ঘেন্নায় নাক উঁচু করেছিল শেষ পর্যন্ত সেই তেওয়ারী তাকে ভালবেসে যে অঘটন ঘটাবে তা ভাবতে পারেনি কেউ। তেওয়ারী বলল, তোকে বিয়ে করব ছবি। ছবিরণ হাতে আকাশের চাঁদ পেল। বলল, ঠাকুর তুমি তো হিন্দু বামুন আর আমি মোল্লা।

উসমে কেয়া হ্যায়। তু হিন্দু হয়ে যা।

কি হল ছবিরণ বুঝতে পারেনি। বিহারী পুরুত এল, মালা বদল হোল।

তেওয়ারী বলল, তু হিন্দু হলি, হামার সাথ তো সাদী ভি হল।

সাদীর আগের দিন ছবিরণ তেওয়ারীর হাত ধরে পালিয়েছিল। তারপর সুদীর্ঘ দেড় বছর পর ছবি এসেছে সাত আট মাসের ছেলে কোলে করে। তেওয়ারীর সঙ্গে ছয় সাত মাস পাকপাড়ার কোন এক বস্তিতে ঘর বেঁধেছিল। তারপরই ছবিরণ জুলুম করতে থাকে তেওয়ারী যাতে তাকে নিয়ে বিহারের নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। তেওয়ারী আজকাল আজ-কাল করে কটা মাস কাটিয়ে দিল। এর মধ্যে ছবিরণ খবর পেল দেশে তেওয়ারীর বউ বাচ্চা আছে।

সত্য ঘটনা জানার জন্য ছবিরণ জুলুম ধরতে থাকে। এর মধ্যে তার প্রসব কাল এসে গেল। ছবিরণ গেল হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ছবি দেখল পাখী উড়ে গেছে। হন্যে হয়ে তেওয়ারীকে খুঁজতে খুঁজতে তেওয়ারীর দেওয়া দেশের ঠিকানায় হাজির হয়ে দেখল সেই গ্রামে একঘর বামুনও নেই। তেওয়ারীকে কেউ চেনেও না। তবুও ক্ষান্ত হয়নি। কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর গেছে তেওয়ারী খোঁজে। সবই বৃথা।

সব ঘটনা বলে ছবিরণ বলল, বুঝতে পারিনি বাবু। বিশ্বাস করেছিলাম। এখন বুঝেছি, এই সব বাইরের লোক, কি হিন্দু, কি মুসলমান এরা এদেশে আসে পেটের দায়ে। ঘরে রেখে আসে বিবি বাচ্চা। সব গোপন রেখে নতুন একটা মেয়ে মানুষের চেষ্টায় থাকে। আমাদের গাঁয়ের জাহানারা সেদিন বলল, ওরা বিয়ে করব বলে মেয়ে মানুষ জোটায় কিন্তু কোন কাবিলনামায় সই করে না।

সুযোগ বুঝে পালায়। এইসব মেয়েরা একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়ে থাকে এদেশে। কখনও ওরা আমাদের দেশের মেয়েকে নিজের মুলুকে নিয়ে যায় না। সত্যিই দেখছি, আমরা গরীব, অনপড়, বোকা তাই ওরা এই কাজ করে, সমাজ অথবা সরকার কিছুই করতে পারে না।

বিকাশবাবু মনোযোগ সহকারে সব শুনলেন। শুধু বললেন, নীচের ঘরটায় তুমি ছেলে নিয়ে থাকো। খাবার ব্যবস্থা করছি তবে তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না।

ছবিরণ থেকে গেল বিকাশবাবুর বাড়িতে।

সামাজিক এই সব সমস্যা নিয়ে বিকাশবাবু কখনও চিন্তাও করেননি অথচ ছবিরণকে কেন্দ্র করে কত কথাই না তাঁকে ভাবতে হচ্ছে।

বিকাশবাবু একদিন সোজা এসে ঢুকলেন আমার ঘরে। বললেন ছবিরণের কথা।

বললাম, জিনিসটা বড়ই গোলমেলে। আমাদের দেশে সর্বজনগ্রাহ্য কোন দেওয়ানী আইন নেই। হিন্দুদের আলাদা আইন, মুসলমানদের আলাদা আইন। যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারা ভোটের কাঙ্গাল। মুসলমানদের ভোট হল ব্যালান্স। ক্ষমতা লাভের জন্য সবদলই চরম সাম্প্রদায়িক দলগুলোকেও তোয়াজ করে। তাই সর্বজনগ্রাহ্য কোন দেওয়ানী আইন তৈরী হয় নি। আর হিন্দু মুসলমানের যে বিবাদ তা কিন্তু ধর্মের চেয়ে কালচার ভিত্তিক। আমরা ভারতীয় হিন্দু আমরা ভারতীয় ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে থাকি। ওরা ভারতীয় মুসলমান, ওরা আরব-ইরাণের ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। যদি সবজনগ্রাহ্য ফৌজদারী আইনের মত সর্বজনগ্রাহ্য দেওয়ানী আইন থাকত তাহলে সেই আইনটা হত ভারতীয় আইন। ভারতীয় আইন ভারতীয়দের ওপর প্রয়োগ করাই হল সব সমস্যা সমাধানের পথ। কিন্তু তা হবে না, হতে দেবে না মৌলবাদীরা।

বিকাশবাবু বললেন, বুঝলাম। চার বিবি আর তালাক দেবার অবাধ অধিকার হারাতে ওরা রাজি নয়। অকারণে তালাক দিলেও তাদের ভারবহন করার কোন চেষ্টাই করে না, কেননা তাদের শরীয়তি আইনে এমন ব্যবস্থা নেই। আমি ভাবছি ছবিরণ কি করবে? তার ভবিষ্যত কি?

ছবিরণকে আবার বিয়ে করতে বলুন। তবে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিয়ে যেন

বিয়ে না করে। বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে যেন বিয়ে করে। এতে তালাক দেবার সহজ সুযোগ নেই, তেমনি খোরপোষের দায়িত্ব যেমন পাকা তেমনি বহু বিবাহ গুরুতর অপরাধ। এই আইনে বিয়ে করানো বাধ্যতামূলক নয় সেজন্য মোল্লারা এই আইনের আওতায় সহজে আসতে চায় না। যাইহোক সবটাই নির্ভর করছে ছবিরণের উপর। বিশেষ বিবাহ আইনে জাতি ধর্মের কোন প্রশ্নই নেই।

বিকাশবাবু বলল, কিন্তু এদের সন্তান?

তারা হবে খাঁটি ভারতীয়। ধর্মের কথা বলছেন। সেটা স্থির করবে শিশু সাবালক হলে। তারা কোন ধর্মের ছায়ায় আসবে কিনা সেটা নির্ভর করবে তাদের ইচ্ছার উপর। তবুও ভারতীয় বলে পরিচয় দেবার কোন অসুবিধা হবে না।

বিকাশবাবু কি বুঝলেন জানিনা। ছবিরণ কি করেছিল তা জানিনা তবে এটা হল গুরুতর সমস্যা যা সমাজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করছে অথচ প্রলেপ দেবার মত দাওয়াই আজও আবিষ্কার কেউ করতে সাহস পায়নি।

উল্টোটা ঘটেছিল মণিকাকে নিয়ে।

সামসুল পাশ করে ছোটখাটো হাকিম হয়েছে। সহপাঠিনী মণিকাকে বিয়ে করেই সমস্যা। রেজিষ্ট্রারের দপ্তরে নাম লিখিয়ে সামসুল আর মণিকা হনিমুনে বেরিয়েছিল। দু মাস সারা দেশ ঘুরে সামসুল বউ নিয়ে হাজির হল বাবা-মায়ের কাছে।

সমস্যা দেখা দিল।

বাবা মনিরুদ্দিন ছিল ইংরেজ আমলের দারোগা। দেশ স্বাধীন হবার পর অনেককাল দেশসেবা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। বর্তমানে অবসর নিয়েছে। নিজের গ্রামে পাকা ইমারত তৈরী করে বহাল তবিয়তে পেনশনের টাকায় আর জমি জমার উৎপন্ন ফসলে দিন ভালই কাটছিল। ছেলে সামসুল সবার ছোট। জন্ম তার স্বাধীনতা লাভের পরে। দেশ ভাগ হবার পর সবাই মণিরুদ্দিনকে বলেছিল, হিন্দুস্তানে থাকিস না। পাকিস্তান হল মুসলমানদের বেহেস্ত, সেখানে যা। নসীব ফিরবে। মণিরুদ্দিন মুর্শিদাবাদের অখ্যাত গ্রামের মায়া ছাড়তে পারেনি। কোন মতেই তাকে রাজি করতে পারেনি শুভাকাঙ্ক্ষীরা। অবসর নিয়ে গ্রামেই বাস করছে।

সামসুল বউ নিয়ে এসেছে সবাই শুনল। ভীড করে মেয়েরা এল বউ দেখতে।

এ কেমন বউ গো, মাথায় কাপড দেয় না, বাইরের মানুষ দেখে ঘোমটা দেয় না। মুসলমান ঘরের নতুন বউ। বুড়ী ধুরী হলে না হয় মাপ করা যেত। এ কেমন আক্কেল। বে-শরীয়তি কাম।

রটে গেল সারা গ্রামে। সামসুলের বউ বে-পর্দা।

মণিরুদ্দিনের কাছে ডেপুটেশন গেল মোল্লাদের। বে-শরীয়তি কাম বন্ধ করতে হবে।

পঞ্চায়েত বসল।

গ্রামের মোল্লা মওলবী এল।

হুকমত আলি হল মোল্লাদের মোড়ল। মণিরুদ্দিনকে বলল, সামসুলের বিবিকে কলমা পড়তে হবে। তার নাম বদল করতে হবে।

মণিরুদ্দিন কোন কথা বলার আগেই সামসুল বলল, যাঁর সম্বন্ধে আপনারা পঞ্চায়েত বসিয়েছেন সে আমার স্ত্রী। আইন সম্মত স্ত্রী। তার স্বপক্ষে আমার অনেক কিছু বলার থাকলেও আমি বলব না। তাতে নিরপেক্ষ কথা বলা যাবে না। আমি মনে করি আমার স্ত্রী এ বিষয়ে তার মতামত দেবার যোগ্য। তাকে ডেকে পাঠাই।

তোবা তোবা। পুরুষদের মজলিশে মেয়েমানুষ ডাকা চলবেনা। মেয়েরা সব সময়ই না-পাক। তারওপর বেপর্দা হওয়া গুনাহ।

সেটা বিচার করবেন খোদাতালা, বলেই সামসুল ডাকল, মণিকা এদিকে এস।

মণিকা সপ্রতিভভাবে পঞ্চায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বলুন আপনারা কি বলতে চান।

হুকমত বলল, তুমি সামসুলের বিবি। সামসুল পাঁচওক্ত নমাজী। তার স্ত্রী বেপর্দা হবে এটা আমরা ভাবতেও পারি না। এটা শরীয়ত বিরোধী। তাই তোমাকে কলমা পড়তে হবে, তোমার মুসলমানী নাম দেওয়া হবে।

মণিকা বলল, আপনারা অনেকগুলো কথা বললেন, তার একসঙ্গে উত্তর দেওয়া যায় না। তবে শেষের কথাটাই আগে বলি। যে মুসলমান সে মুসলমানী নামের অধিকারী। আর মণিকা মেহেরুন্নেসা হলেই তার চরিত্র, দেহ, মন বদল

হয় না। সেজন্য আপনাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না।

সামনে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় এতটা সন্ত্রস্ত হত না। আফসার আলি পাশে বসেছিল, সে বলল, মুসলমানকে বিয়ে করলে অথচ তুমি মুসলমান নও?

সামসুল হিন্দুকে বিয়ে করেছে সেতো হিন্দু হয়ে যায়নি। মেয়েদের বেলায় বুঝি এত কড়াকড়ি। কলমা পড়ে মুসলমান হব না বলেই আমরা বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে করেছি। এই আইনে ধর্মের কোন বাধা নেই। হিন্দুর বউ যদি মুসলমানের মেয়ে হয় তা হলেও তাকে হিন্দু হতে হয় না, আবার হিন্দুর মেয়ে মুসলমান বিয়ে করলেও তাকে মুসলমান হতে হয় না। নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দুজনেরই থাকে। সেজন্য কলমা পড়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমাদের বিয়েটা আর কিছুই নয়। দুইজন সম মনোভাবাপন্ন নারীপুরুষের যৌথ জীবনের স্বীকৃতি মাত্র।

তোবা তোবা। অবাক কাণ্ড, তুমি তো কাফের। তুমি সামসুলকেও কাফের করতে চাও। ধৃষ্টতা কম নয় তোমার। তোমাদের পরিবার সমাজে আটক হবে।

আমাদের আটক করতে পারেন কিন্তু আমাদের পরিবারের কি অপরাধ।

সেটা তোমাদের বিবেচনা করতে হবে না। তোমরা মুসলমান সমাজ থেকে খারিজ। তোমাদের আটক করা হল। মণিরসাহেব তবুও একবার ভেবে দেখবেন।

মণিরুদ্দিন আমতা আমতা করে বলল, পঞ্চায়েতের হুকুম মানতে আমি বাধ্য। আপনারা বলুন আমি কি করব?

সামসুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মণিকা তুমি ভেতরে যাও। আর বড়মিঞা শুনে রাখুন। আপনাদের পঞ্চায়েতের হুকুম মানতে আমি এবং আমার স্ত্রী বাধ্য নই। কোন অন্যায় কাজ আমরা করিনা, অন্যায় কাজকে সমর্থনও করি না। আমার আর কিছু বলার নেই।

সেই রাতেই গরুর গাড়ি চেপে সামসুল আর মণিকা রওনা দিল। গন্তব্যস্থল সামসুলের কর্মক্ষেত্র কোন একটি মহকুমা শহর।

সামসুল আর মণিকা, ছবিরণ আর তেওয়ারী একই গোত্রের হলেও সামসুল ও মণিকার আর্থিক বনিয়াদ ছিল শক্ত আর শিক্ষা দীক্ষায় তারা ছিল অনেক উঁচুতে, আর ছবিরণ আর তেওয়ারীর আর্থিক দৈন্য এবং অশিক্ষা ও অনাচারের অভাবে বিপত্তি ঘটেছিল। একই বস্তুর বিভিন্ন দিক। এতে অগৌরবের কিছু

নেই, আবার দম্ভ করার মত পরিবেশও নেই।

আরও উল্টো খবর শুনিয়েছিল নিয়ামত আলি আর সাকিনা বিবি।

তিন তালাকি বিবি সাকিনা তৃতীয় স্বামী নিয়ামতের ঘর করছিল সুখেই। নিয়ামতের বয়সটা বেশি। তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হলেও সাকিনা তখনও যৌবনে ভরপুর।

নিয়ামতের অসাক্ষাতে হাবিব মিঞা আসত মাঝে মাঝে ভাবীর খবর নিতে। কেউ কিছু জানল না। হঠাৎ দেখা গেল সাকিনা বেপাত্তা। হাবিব নিরুদ্দেশ।

নিয়ামতের কাছেই শুনেছিলাম। বলতে পারিনি কিছু। তবু মনে মনে ভেবেছি, মনুষ্যত্বকে এভাবে জবাই করে আজও পৃথিবী চলেছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার মত মনোবল ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

অরুণ এবং নীলিমার ব্যাপারটাই ছিল বেশ উপভোগ্য। দুজনেই সহপাঠী। নীলিমার বয়স আঠারো পেরোলেও অরুণ তখনও বিশ বছর ছুঁতে পারেনি। তারা গিয়ে হাজির হল বিশেষ বিবাহ আইনের রেজিস্ট্রারের কাছে। যথারীতি তিনজন সাক্ষীর সামনে সই করে তারা আইনানুগ স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করল।

রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়েই অরুণ বলল, চল, দক্ষিণেশ্বর গিয়ে দেবী ভবতারিণীকে প্রণাম করে দেবীর ছোঁয়া সিঁদুর তোমার মাথায় পরিয়ে দিই।

নীলিমা বলল, না!

সে কি? তুমি দক্ষিণেশ্বর যাবে না?

না। দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর কোন ঈশ্বরের কাছেই যাব না। এত যদি তোমার ধর্ম বুদ্ধি ছিল তা হলে ছাঁদনা তলায় কেন বসলে না। আমি তোমার ধর্মপত্নী নই। আমি তোমার কানুনপত্নী। অর্থাৎ কানুনে তুমি বাঁধা পড়েছ। ধর্মে নয়।

কোথায় যাবে বল?

স্ত্রীরা কোথায় যায়? স্বামীর ঘরে। আমিও স্বামীর ঘরে যাব।

না।

কেন?

বাবা-মাকে বলা হয় নি। তাঁদের বুঝিয়ে বলব, তাঁদের সম্মতি নেব।

তারপর তোমাকে তুলব আমার বাড়িতে।

রাবিশ! তুমি কাওয়ার্ড। তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করতে চাও। তা হবে না। আমাকে তোমার বাড়িতে সসম্মানে নিয়ে যেতে হবে। নইলে এ বিয়ে নাকচ।

নাকচ!

হ্যাঁ। আমি কোন কাওয়ার্ডের সঙ্গে ঘর করতে চাই না। চল রেজিস্ট্রারের অফিসে। সেখানে গিয়ে বিয়ে নাকচ করে আসতে হবে। চল আর দেরী করনা।

অরুণকে টানতে টানতে নিয়ে গেল রেজিস্ট্রারের কাছে।

আমাদের বিয়ে খারিজ করতে হবে স্যার। আমরা স্থির করেছি, এ বিয়ে নাকচ করব।

রেজিস্ট্রার হেসে বলল, ঘর জোড়া দেওয়া আমার কাজ। ঘর ভাঙ্গার দায়িত্ব আদালতের। বিয়ে দিতে পারি, বিয়ে ভাঙ্গতে পারি না। এ ক্ষমতা আমার নেই।

নীলিমা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, বেশ। মেনে নিলাম, অরুণ তুই এখানে বস। আমি বাড়ি যাচ্ছি। যা হয় পরে বলব।

নীলিমার সঙ্গে অরুণের আর দেখা হয়নি। একবার শেষ দেখা আদালতে।

অরুণ আর নীলিমা নতুন করে ঘর বেঁধেছিল কিনা জানি না।

কিন্তু সুমিতা ও অরূপ নিজেদের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধতে পারেনি। অনেক গভীরে প্রবেশ না করলে ওদের বিচ্ছেদের কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

সুমিতা আর অরূপ দুজনেই শিল্পী। সুমিতা নৃত্য শিল্পী, সঙ্গীতে পারদর্শী আর অরূপ হল কলা ও ভাস্কর্যে অনবদ্য শিল্পী। দুজনের পরিচয়ও হয়েছিল শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে।

অরূপ প্রস্তাব দিল বিয়ের।

সুমিতাও রাজি।

কিন্তু উভয়েই চায় পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে ঘর বাঁধতে। সুমিতার বাবা প্রস্তাব দিল অরূপের বাবাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রোপোজ্যাল একসেপটেড। বাঙ্গালীর সর্বপ্রকার আচারণের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান অনুসারে বিয়ে হল।

অভ্যাগতরা পরিতৃপ্ত হল ভূরি ভোজনে।

এরপর মাসও কাটল না।

অরূপ আর সুমিতার নতুন সংসারে হাজির হল সুমিতার জননী নবশশী।

অরূপের আয় কম। তবুও স্থায়ী বাসিন্দা শাশুড়ির ভরণ পোষণে কোন কার্পণ্য করত না। এবার এল সুমিতার দুই ভাই। তাদের কলেজে পড়ার অসুবিধা হচ্ছে নিজের বাড়িতে থেকে, তাই তারা মায়ের কাছে থাকতে চায়।

অরূপের স্কন্ধে উপরি বোঝা।

অভাব দেখা দিল। প্রতিদিন নবশশীর বিষবাক্যে অস্থির হয়ে অরূপ সুমিতাকে বলল, এভাবে তো আমাদের দিন চলবে না। অভাব নিত্যকার। আমার আয় কম। তুমি কিছু ভেবে দেখেছ?

ভাবব কি? বলেই সুমিতা চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অভাব অভিযোগ আছে ঠিকই তা বলে নিজের মা ভাইকে তো চলে যেতে বলতে পারি না।

কিন্তু তোমার মা যে ভাবে বাক্যবাণ ছুঁড়ছেন তা আর সহ্য করতে পারছি না।

আমার মা তো তোমারও মা। ওভাবে কথা বললে তাকে অসম্মান করা হয়।

অসম্মান করতে চাইনি সুমিতা। তবে শ্রদ্ধাটা উভয় পক্ষীয় বিষয়। উনিও জামাতার মর্যাদা দিলে আমিও শাশুড়ির মর্যাদা তাঁকে দেব।

সুমিতা বলল, উনি গুরুজন, এটা ভুলে যেও না।

অরূপ বলল, গুরুজনকে সদা নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য অবহিত থাকা উচিত।

আরও কতদূর এই বাক্য বিনিময় চলত তা বলা কঠিন তবে হঠাৎ একদিন নবশশী অরূপকে বলল, আমি সুমিতাকে নিয়ে দেশের বাড়িতে যাব। ছেলেরাও যাবে।

অরূপ মাথা হেট করে বলল, আপনার ইচ্ছা। সুমিতা কি যেতে ইচ্ছুক?

অবশ্যই।

তল্পীতল্পা বেঁধে নবশশী রওনা হয়ে যায় তার ছেলেদের নিয়ে।

দু সপ্তাহ কেটে গেল। কোন পৌছানো সংবাদ না পেয়ে অরূপ ব্যস্ত হয়ে

উঠল। চিঠি লিখল সুমিতাকে। চিঠি ডাকে দেবার চতুর্থ দিনে উত্তর পেল অরূপ। উত্তর এল আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশের আকারে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। অরূপ ছুটে গেল তার সহপাঠী এক উকিল বন্ধুর কাছে।

নোটিশ পড়ে বন্ধুটি বলল, কি করবি বল। লড়বি, না ছেড়ে দিবি।

আমি তো ছাড়ার নোটিশ দেইনি।

তা হলে লড়বি।

না। মন যখন ভেঙেছে তখন আইন তাকে জোড়া দিতে পারবে না। আমি তো মানুষ। পশুপক্ষী নই। সন্তান সৃষ্টির জন্য মেয়েমানুষের দরকার আমার নেই।

তা হলে অভিযোগ মেনে নিবি।

দেখ, কখনও আমি সুমিতার গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা, কখনও কড়া কথাও বলিনি। আর মানসিক নির্যাতন সুমিতা ভোগ করেনি, ভোগ করেছি আমি, তাও শাশুড়ি শ্রীমতী নবশশী দেবীর গঞ্জনায়। সবই সাজানো ব্যাপার। তাই মেনে নেওয়া, না নেওয়া একই কথা।

এরপরই এক তরফা ডিগ্রি পেয়ে সুমিতা আবার কুমারীর মর্যাদা আদায় করল আর অরূপ কোথায় যেন চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু সুমিতার কাহিনী এখানেই শেষ নয়।

নবশশী হিসাব করে দেখল পিতৃগৃহের দ্বিগুণ সম্পত্তি নিয়ে সুমিতা বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে। কিন্তু হরিরামবাবু বিশেষ চিন্তিত। কারণ, হরিরামবাবু বুঝেছেন, সুমিতার বিবাহ বিচ্ছেদ কারও পক্ষে আনন্দদায়ক না হলেও তাঁর স্ত্রী নবশশীর বিশেষ আনন্দের উৎস হয়েছে। অরূপের বাবা-মায়ের দেওয়া গয়নাগুলো উপরিলাভ হয়েছে। এটা কি কম কথা। হরিরাম কিন্তু খুশী নয়। সুবোধ ঘোষের ঠগিনী গল্পের ছায়াছবি দেখে সে খুব চিন্তিত হয়েছিল। নবশশীকে সাহস করে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। সুমিতা বিচ্ছেদের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে শিক্ষকতা করার জন্য বিশেষ ট্রেনিং নিতে কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

তারপর একদিন বিবাহ বিচ্ছেদকারী কোন এক সওদাগরী অফিসের অফিসারের সঙ্গে মালা বদল করে রেজিস্ট্রারের খাতায় নাম লিখে সুমিতা

আবার পিতামাতা ও গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করল। এবার পতিগৃহ বেশ কিছু দূরে কোন এক বৃহৎ শহরের অভিজাত এলাকায়। তিন মাস মাত্র কেটেছে, এর মধ্যেই জানা গেল সুমিতা সন্তান সম্ভবা। নবশশী বোধহয় এরই অপেক্ষা করছিল। সন্তান সম্ভবা জেনেই নবশশী নিজেই গেল সুমিতাকে আনতে।

সে সময় শাশুড়ি জামাতার কথোপকথনের কোন রেকর্ড নেই। স্বামী-স্ত্রীর কথোপোকথনের কোন রেকর্ডও নেই। সুমিতা কোন সময় তার ব্যক্তিগত কথাও বলেনি। সুমিতাকে নিয়ে আসার পর বিপন্ন হল নবশশী। মাতা ও কন্যার কলহের সাক্ষীও কেউ নেই। যথা সময়ে সুমিতা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল।

তিন মাসের সন্তান গর্ভে নিয়ে সুমিতা মায়ের কাছে এলেও তার স্বামী তার প্রসবকালীন ব্যয়ের জন্য কোন পয়সা তো পাঠায়নি, উপরন্তু চিঠি দিয়ে সুমিতার খবর নেবার প্রয়োজনও মনে করে নি। বছর কেটে গেছে, ইতিমধ্যে সুমিতার সন্তান কোলে এসেছে, তার অন্নপ্রাশন দেবার দিন স্থিরও হয়েছে। নবশশীর ইচ্ছা ছিল সব কিছু তার বাড়িতে করা হোক কিন্তু সুমিতা বেঁকে বসল। বলল, আমার শশুর শাশুড়ি এখানে নিজের বাড়িতে থাকেন আমি তাদের কাছেই যাব। সেখানে খোকার অন্নপ্রাশন হবে।

তোর স্বামী তো কোন খোঁজ করে না। একটা পয়সাও দেয় না। এমন অবস্থায় তোর ছেলের অন্নপ্রাশনের খরচ তো আমাকেই দিতে হবে।

না দিতে হবে না। আমি শ্বশুরের ভিটায় যাব। তারা নমো নমো করে যা করবে তাই আমি মেনে নেব।

তোর স্বামী আসবে কি? এমন পাষণ্ডের সঙ্গে বাস করবি কি করে! নিজের সন্তান দেখতে যে আসে না সে কি মানুষ। তুই আমার সঙ্গে আসার পর থেকে সে একবারও আসেনি, তোর কোন খবরই নেয়নি। যে লোকটা এত ইতর তার বাবা মায়ের কাছে কতটা মর্যাদা পাবি তা জানিনা। আমার ইচ্ছা নয় তুই সেখানে যাস। আমি খোরপোষ আদায় করব।

তবুও আমি শশুর শাশুড়ির কাছেই যাব। তুমি দিয়ে এলে ভাল, নইলে ছেলে কোলে করে আমি নিজেই যাব। আমি তোমার জামাইকে চিঠি দিয়েছি। আমার বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই আসবে অন্নপ্রাশনের দিনে।

সুমিতার স্বামী সত্যি এসেছিল অন্নপ্রাশনের দিন। তবে আগের দিন রাতে এসে অন্নপ্রাশনের পরের দিনই সে চলে গিয়েছিল তার কর্মক্ষেত্র। দেড় বছরের মধ্যে কেন যে এমনটা হল তা কেউ স্থির করতে আজও পারেনি। তবে মাঝে মাঝে নবশশী দাঁত কিড়মিড় করে। হরিরামকে শাসায়, বেটাকে দেখে নেব। মেয়েকে নিয়ে আসব, খোরপোষ আদায় করে তবে ছাড়ব। কিন্তু সুমিতাকে কোন ক্রমেই রাজি করাতে পারেনি। সুমিতা হয়ত বুঝেছে মায়ের আশ্রয়ের চেয়ে শশুরের আশ্রয় অনেক নিরাপদ এবং তা তার অধিকারের মধ্যে। সুমিতা তার নিজের ভাগ্য নিজেই পরিচালনা করবে, নবশশীর ডিক্‌টেশ্যন মোটেই শুনতে রাজি নয়। হরিরাম অসহায়ের মত ঘুরে বেড়ান। সহজে নবশশীর সামনে যান না।

ব্যস্ত হয়ে ত্রিলোচন ত্রিপাঠী এসে এসব খবর শুনিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল, এই ভাবে সমাজ ব্যবস্থা চলতে পারেনা।

বললাম, নবশশী কি চায় সেটাই জানা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে অন্যের অনুপ্রবেশ সব সময়ই অশান্তি সৃষ্টি করে। এই সত্যটা বোধ হয় সুমিতা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছে বলেই মনে হয়। আর সমাজ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেই বদল হয়।

সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে দিন দিন। অথচ আমরা সবাই সমাজ রক্ষার জন্য অনবরত চিৎকার করে চলেছি। যে সমাজে অর্থ হল মানদণ্ড সে সমাজে মানুষের উচ্চ বৃত্তিগুলো ঝাপসা হওয়াই স্বাভাবিক। এই আর্থিক অবস্থার নাশত্বই হল আজকের মানসিকতা।

।। ছয় ।।

রাজা কৃপানাথের পৌত্র কুমার (?) ভূপতিনাথকে দেখলাম কেরোসিনের একটা ছোট টিন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আমাকে দেখেই ম্লান হাসি হেসে বলল, দাদা যে, এত সকালে বের হয়েছেন বুঝি মর্ণিং ওয়াক করতে ?

বললাম, হাঁ। আর তুমি বুঝি কেরোসিনের সন্ধানে বের হয়েছ।

আর বলবেন না। চার পাঁচটা দোকান ঘুরে এলাম, তেল নেই সাইনবোর্ড

দেখে ফিরে আসছি। আর কেরোসিন না হলেই নয়। সেই শেষ রাতের অন্ধকারে বেরিয়েছি আর এখনও এক লিটার তেল সংগ্রহ করতে পারলাম না।

বললাম ভায়া, তেল দিয়েই তেল বের করতে হয়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ অনেক সময় টিউবওয়েলে জল উঠছে না অথচ ওপর থেকে বালতি কয়েক জল টিউবে ঢেলে দিয়ে পাম্প করলে জল ওঠে। এও সেই রকমই। তেল দিয়ে তেল পাম্প করলে তবেই তেল পাবে।

ঠাট্টা করছেন দাদা!

না ভাই। ঠাট্টা নয়। শেষ রাতে তেলের গাড়ি আসে। ব্যারেল ভর্তি হয়। তারপরই তেল পাচার হতে থাকে। এই শহরের তেল বিক্রেতাদের অধিকাংশই বহির্বঙ্গের হিন্দীওলা, আর বাজারে অলিতে গলিতে যে সব দুই চাকার গাড়িতে চোরাই তেল বিক্রি হয় তারাও বহির্বঙ্গের হিন্দীওলা। একটা চেইনে ডিলার আর চোরাকারবারী সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে, প্রশাসন নীরব দর্শক। আবেদন করলে তারা এনফোর্সমেন্টকে দেখিয়ে দেয়। দরকার হলে তারা ও-এন-জি-সি যাবার উপদেশও দেয়। এটাতো নিত্যকার ঘটনা। যেটুকু তেল শেষ পর্যন্ত ডিলারের কাছে থাকে তার একটা অংশ দিতে হয় পাড়ার মস্তানদের। চোরা কারবার বজায় রাখতে মস্তানদের হাতে রাখতে হয়। তলানিটা পায় হতভাগা ক্রেতারা। যারা শেষ রাত থেকে লাইন দেয় তেলের দোকানের সামনে। তাও পুরো ওজন পায়না।

এর কোন প্রতিকার নেই?

না! বললাম, এই কাজ চলে চেইনে। উপরে ভগবান অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থা নীচে চোরাকারবারী, এদের লেনদেনের চেইনে নাক ঢোকায় কার সাধ্য। প্রধান সহায়ক পুলিশ, এটা ভুলো না ভায়া।

ভূপতিনাথ তেলের টিন হাতে করে বোধ হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম দোকানের সন্ধানে গেল। পিছিয়ে তাকালাম।

ভূপতিনাথ তখন স্কুলে আসত মরিস গাড়ি চড়ে। সঙ্গে থাকত আর্দালি। ভূপতিনাথ রাজকুমার।

সেই রাজকুমার তেলের টিন হাতে করে ছুটছে।

দুঃখের অথবা লজ্জার তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

কথায় বলে বিধিলিপি।

কোন একসময় ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করতে কৃপানাথের পূর্বপুরুষ খুব বেশি মেহনত করেছিলেন। উপঢৌকন পেয়েছিলেন বিশাল জমিদারী। তারপর অংশীদার, তস্য অংশীদার, তস্য অংশীদার হতে হতে জমিদারের রাজ্য ক্ষুদ্র হতে থাকে। তবে রাজার জৌলুষ তাতে লাঘব হয়নি। হঠাৎ ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেল। এত বড় বেইমানী করবে ইংরেজ রাজারা তা ছিল কল্পনাতীত। যাবার সময় দেশীয় রাজন্যদের স্বাধীন হবার কথা স্বীকার করলেও, বাংলার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছুই করে যায়নি। ইংরেজ চিরকাল বেইমান, তারা বেইমানী করে দেশ দখল করেছিল, ঘরে ঘরে বেইমান তৈরী করে নিজের রাজ্য কায়েম রেখেছিল, শেষ অবধি বেইমানী করে তাদের সৃষ্ট জমিদারদের পথে বসিয়ে গেল বেইমানী করে।

রাজা কৃপানাথের বংশধররা এমন অবস্থার কথা চিন্তাও করেনি।

বুদ্ধিমান বংশধররা সচেষ্ট হল আইন সভায় কোন ক্রমে প্রবেশ করে মন্ত্রীত্ব পাবার।

যারা একটু ভালমানুষ সরল সহজ তারা ভূপতিনাথের মত তেলের টিন হাতে করে রাস্তায় ছোটাছুটি করতে বাধ্য হল।

বলভদ্র পাকড়াশি বিধান সভার সদস্য।

এবার নির্বাচনে আবার টিকিট পেয়েছে।

তার এলাকা ইতিমধ্যে পোস্টার, দেওয়াল লিখনে ভর্তি।

শুনেছি বলভদ্র ভূপতিনাথের সহপাঠী। তবে বোধহয় বন্ধু নয়। ভূপতিনাথ গান্ধীবাদী ও নির্বিবাদী, আর বলভদ্র মার্কসবাদী ও জঙ্গীবাদী। তাই দুই সহপাঠীর মতৈক্য হবার কোন সম্ভাবনা কোন দিনই ঘটেনি।

ভূপতিনাথ বলেছিল, সব বোগাস। জানেন দাদা, যারা গরীবের বন্ধু বলে নিজেদের জাহির করে তাদের দু চারটে বাড়ীঘর দেখেছেন কি। এই তো বিধাননগরে একটি দরিদ্র বান্ধব মাত্র দশ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করে খাসা দোতালা করেছে, আর বাবা বৈজনাথ ধামে সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে বিশ্রাম আগার করেছে। এত টাকা কোথায় পেল বলতে পারেন দাদা? ওরা অন্যের হিসাব চায়, নিজের হিসাব দেয়না।

বলভদ্রই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? অর্জুন সিংহের বিশাল মার্বেল প্যালেসের ছবিটা দেখিয়ে বলে, এটা বুঝি গান্ধীবাদ? তোদের কোন লোকটা

পরিষ্কার বলতে পারিস ?

ভূপতিনাথ বলেছিল, ক্রেডিট আর ডেবিট উভয় পক্ষেরই সমান সমান, আর নীল ব্যালান্স রয়েছে আমার তোমার মত লোকদের জন্য।

বলভদ্র দমবার পাত্র নয়।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আর সোমনাথ থেকে ইম্ফল অবধি একটি ক্রশ টেনে খুঁজে বেড়াচ্ছে গান্ধীবাদীদের অ-গান্ধীজনোচিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস। ভূপতিনাথ পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে বসল, কোথায় কি ভাবে মার্কসের নামে মার্কসীয় দর্শনকে অবমাননা করেছে। যথাযথ জবাব দেবার জন্য উভয়েই ব্যস্ত।

রাজার ছেলের রাজত্ব আর নেই কিন্তু রাজত্বের মোহ তো আছে। বাদশাহী জমানার খোয়াব আজও কোন কোন মিঞা সাহেব দেখে আর গোঁফ দাড়িতে আতর মাখে। কেউ কেউ ভারতে বসেই পাকিস্তানের সমৃদ্ধি কামনা করে মনের নৈরাশ্যকে ভুলতে চায়। ভূপতি বোধহয় অতীতের স্মৃতি ভুলতে না পেরে মাঝে মাঝে নিজের হাত শোঁকে পূর্বপুরুষ যে ঘি খেয়েছে তারই গন্ধ পেতে। তবুও কঠিন বাস্তব তাকে কেরোসিনের টিন হাতে করে দৌড়াদৌড়ি করতে বাধ্য করে। কখনও ভাবে না সে একটি আভিজাত্যের ফসিল।

বলভদ্র এ বিষয়ে খুবই ভদ্র।

কেরোসিনের হাঙ্গামা তাকে পোহাতে হয় না। এই সব ছোট কাজ করে হোটেলওলা। নগদ কড়ি ফেলে দিয়েই ডিউটি শেষ। বলা যায়, বলভদ্র নিরালম্বন স্বামী, অবলম্বন তার নেই। তবে ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটা কাউকে জানতে দেয় না। খুবই সচেতন সর্ব বিষয়ে।

বলভদ্র ও ভূপতিনাথকে কখনই একসঙ্গে পাইনি। মনে হয় তাদের ভাসুর-ভাদ্দর বউ সম্পর্ক। উত্তর থেকে যদি বলভদ্রকে আসতে দেখে তখনই পথ পরিবর্তন করে ভূপতিনাথ পশ্চিম দিকে চলতে থাকে, বিপরীতটা ঘটে বলভদ্রের বেলাতে অথচ দুজনেই সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু। কখন কদাচিৎ যদি দেখা সাক্ষাৎ হয়, শুনেছি দুজনেই আপ্যায়নের হাসি হেসে বলে, কেমন আছিস ?

জবাব দেবার অবসর কারও থাকে না।

কেউ জিজ্ঞেস করলে বলল, ভূপেটা হল বড়লোকের লালটু ছেলে। ওর কোন ক্যারেকটারই নেই। কোন রাজা-মহারাজার গুলমারা গল্প।

ভূপতিনাথকে জিজ্ঞেস করলে বলে, ভাসু যখন খেতে পেতনা তখন আমি

খাওয়াতাম। আমার টিফিনের বেশির ভাগটাই বলু খেয়ে নিত। নিমকহারাম। এখন গরীবের বন্ধু কমুনিষ্ট হয়েছে। যাও না বলুর কাছে, দেখবে কেমন গরীবের বন্ধু, একটা সার্টিফিকেট চাও অমনি গরজ বুঝে ওর চেলারা দশ বিশ হাতড়ে নেবে। ছোঃ! এ আবার গরীবের বন্ধু। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরবাড়ি এক মন চাল সেদ্ধ হত পরিতোষ করে রোজ কয়েক শ' লোকের পেট ভরাতে।

বলভদ্র কারও মুখে ভূপতিনাথের মন্তব্য শুনলেই তেলে বেগুনে জলে উঠত। বলত, এই কথা বুঝি বলেছে ভূপে। তা ও বলতে পারে। ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তস্য ঠাকুরদা ছিল হেসটিংসের বাবুর্চি। তার পরের ঘটনা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

গল্পের গন্ধ পেয়ে সবাই যখন ঘিরে ধরে তখন বার বার ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে। তারপরই বলে, অ্যাসেমব্লির টাইম হয়ে এসেছে, গল্প করার সময় নেই ভাই। ভূপের কাছেই শুনে নিও। সত্যি মিথ্যা যাচাই হয়ে যাবে।

কথাটা কানে যেতেই বলল, শালা বলু এই কথা বলেছে। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব তা হলে। ওর ঠাকুরদার পিসি ছিল জনস্টন সাহেবের ইয়ে।

ইয়েটা কি ভূপুদা?

এটা বুঝলে না। যাকে জলপাত্তর বলে। আজকের দিনে যাকে বলে রক্ষিতা। ওদের রুটিরুজি তো জনস্টন সাহেবের সম্পত্তি থেকে আজও চলছে। শালার জন্মেরই ঠিক নেই আর রাজা কৃপানাথের পূর্বপুরুষকে হেসটিংসের বাবুর্চি বলে মানহানি ঘটাচ্ছে। কলকাতা শহরে কে যে কি ভাবে সম্পত্তি করেছে তার হদিস কজন জানে।

বলভদ্র বলল, ভূপের কথা আর বলিস না! টুকলিবাজ। আমার খাতা টুকলি করে প্রবেশিকাটি পাশ করেছে। রেজাল্টের লিস্ট দেখিনি, সত্যি পাশ করেছে এটাও জানিনা। শুনেছি। তবে ও নিজেও জানে কান্তমুদীর ভাগ্য কি করে ফিরেছিল, মহারাজা নবকিষেণ তথা নবকেষ্টদের কি করে জমিদারী হয়েছিল। এগুলো তো ইতিহাসের কথা, এমন কথা তো কৃপনাথের ইতিহাসে লেখা হয়নি, লেখার লোক ছিল না। আমার ঠাকুরদা বলতেন, এনিস সাহেবের হুঁকা বরদার শেষ অবধি চাঁদনিতে তিন বিঘে জমির মালিক হয়েছিল। সাহেবদের দিল ছিল দরাজ। বাবুর্চি, হুঁকা বরদার এদের সম্পত্তি সাহেবদের

দয়াতে। আর লাট সাহেব হেসটিংসের বাবুচি। এ কি কম কথা। সেকালে সাহেবদের চেয়ে গোলামদের ছিল বেশি দাপট। গোলামের দাপট তো আজও দেখতে পাও।

কবির তরজা লড়াই নিয়ে দুজনে বেশ আনন্দে দূরত্ব রক্ষা করে চলে।

ঘটনাটা একটু বাঁকা পথ ধরল যখন বলভদ্র শুনল, রাজা কৃপানাথের বাস্তু জমি প্লট করে বিক্রি করছে ভূপতিনাথের বাবা। চট্‌পট্‌ একটা কো-অপারেটিভ করে বলভদ্র তার চেলাদের পাঠিয়েছিল রাজার বাস্তুজমি কিনতে।

কো-অপারেটিভ থেকে রাজবাড়ির ছ বিঘা জমির দেড় বিঘা কিনে নিল। এবার বলভদ্র হল রাজা আর ভূপতিনাথে 'ভূ' গেল। তার ঘরের 'পতিত্ব' কোন রকমে রক্ষা করার পর ভূপতিনাথ নিজের মনেই বলল, এই সব বাড়িঘর সবই যাবে। এ সবই পাপের সম্পত্তি। অভিশপ্ত! অভিশপ্ত!

আজও কিন্তু বলভদ্রের ও ভূপতিনাথের যৌথ বৈঠক সম্ভব হয় নি। উভয়ে উভয়ের নিন্দা ধান্দা করেই খালাস।

অনেকের মুখে এসব শুনেছি।

অনেকে আলোচনাও করেছে।

আমি বলেছি, একটা কথাই ঠিক!

কি কথা?

অভিশপ্ত। অর্থাৎ সম্পদের অভিশাপ বহন করছে কৃপানাথের উত্তর পুরুষ। সম্পদ সংগ্রহ করেছিল পাপের পথে, সম্পত্তি ভোগ করেছে বিনা মেহনতে পরকে শোষণ করে। আজ এই পাপের মূল্য দিতে হচ্ছে উত্তর পুরুষদের।

সুকুল বলেছিল, মধ্যযুগে এরাই কিন্তু হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করেছে।

আমি বলছি সর্বনাশ করেছে।

মানে।

মানে ইংরেজের কারপরদাজ হয়ে যারা সম্পত্তি ভোগ করেছে তাদের রক্ষা-কবচ তৈরী করে দিয়েছিল কর্ণওয়ালিশ। অর্থাৎ অলস বিলাসবহুল শোষক শ্রেণীর বহু বৎসরের গ্যারান্টি থাকায় কোকিল শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। ওরা ইংরেজের দরজায় কোকিলের মত মধুর সঙ্গীত শোনাত আর প্রজাদের শোনাত বায়সের কর্কশ কঠোর রব। পরিণতি কি জান?

পরিণতি নতুন করে কাউকে জানাতে হয়নি।

সবজন বিদিত এই অবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণ।

সুকুল তবুও বলল, এই সব জমিদাররা বহু জনহিতকর কার্য করেছে।

বললাম, আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয় কিন্তু সেটাও শোষণের নামান্তর। কোন এক জনহিতকামী জমিদার স্থির করলেন, তাঁর প্রজাদের রোগের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তাই তাঁর দুটি তহশীল অফিসে দুটো দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। ইংরেজ সরকার এই মহান কাজ দেখে তাঁকে 'রাজা' উপাধিও দিল। আসল ঘটনা জানাল দেশের বুদ্ধিজীবিরা। দুটো চিকিৎসালয়ে আজ থেকে সত্তর বছর আগে পঞ্চাশ টাকা বেতনের দুজন ডাক্তার আর বাব টাকা বেতনের দুজন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করলেন রাজা বাহাদুর।

সুকুল বাধা দিয়ে বলল, ভালই তো করেছিলেন।

ঠিক বলেছ সুকুল। ভাল কাজকে সবাই সমান চোখে দেখে না। জরাসন্ধের লৌহকপাট পড়েছ? জেলখানার ডাক্তারদের কয়েদীদের দুটো রোগের চিকিৎসায় পারদর্শী হতে হয়। একটা হল বোখার, অন্যেকটা হল পেটগড়বড়ি। এইসব গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারদেরও এই দুটো রোগের চিকিৎসা করলেই মাসকাবারী বেতন যেমন জুটত, তেমনি সামান্য অর্থ ব্যয়ে কুইনাইন মিকশ্চার আর কারমিনেটিভ মিকশ্চারে সব রোগের চিকিৎসা করে কৃতিত্ব লাভ করত।

সুকুল বলল, এরকম তো কোন ব্যবস্থা আগে কেউ করেনি। এটা তো মন্দের ভাল।

ঠিক বলেছ ভাই। রাজা বাহাদুরের হাজার দুয়েক টাকা বাৎসরিক ব্যয় হত এই দাতব্য চিকিৎসায়।

অর্থাৎ সে কালে দু হাজার তো কম কথা নয়।

অবশ্যই কিন্তু কে এই দাতব্য করত? রাজা অথবা প্রজা? রাজা তার ন দশ হাজার হোল্ডিং-এর প্রজাদের ওপর চার আনা সেস ধার্য করে টাকাটা উশুল করতেন। দাতব্য ব্যবস্থা চালিয়ে কিছু মুনাফা তার পকেটেও থেকে যাকে। এই রকম হিতকারী জমিদারের সংখ্যা কিন্তু নেহাৎ কম ছিল না।

সুকুল চুপ করে গেল।

বললাম, এই ট্রাডিশন আজও চলছে ভাই। দাতব্য নামক একটি ভাল বিজনেস আজও চলছে। আগে এসব বিজনেস চালাতো জমিদাররা আজকাল চালাচ্ছে মার্চেন্ট প্রিন্সরা। বিড়লার দিকে তাকাও। তার যত প্রতিষ্ঠান আছে সবই বিজিনেস। ধান্দা আর শুভলাভ, নাফা। এমন কি বালিগঞ্জে যে মন্দির তৈরী হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হবার আগে ভাড়া খাটানো হচ্ছে বাইরের নানা উৎসবে। মন্দির ব্যবসা, প্ল্যানেটোরিয়াম ব্যবসা, কলামন্দির ব্যবসা, মিউজিয়াম ব্যবসা। এঁরা মহান ব্যক্তি, মহান কাজ করেন কিন্তু 'নাফা' না হলে এক কড়িও ব্যয় করেন না। একই ঐতিহ্য।

সুকুল গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

বাদল মিস্তিরির দোকান থেকে কয়েক ভাঁড় চা আসাতে সুকুল নতুন উৎসাহে বেশ ভাল হয়ে বসল।

কিছু বলতে চাও ভাই?

সুকুল হেসে বলল, সবই ঠিক তবে সে জমানা নেই দাদা। আজ রাষ্ট্র হল কল্যাণধর্মী। বিড়লা অথবা থাপারদের অথবা তাদের মত অনেক শিল্পপতি-ই হয়ত 'নাফা' নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু সরকার তো 'নাফা'র চিন্তা করে না। তাই নানা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

অবশ্য সরকার কল্যাণকামী। দেশের মানুষ যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, বেকার সমস্যা না থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে সরকার সব সময়ই মনোযোগী। সত্যি-ই কি তাই?

সুকুল বলল, যদি তা না হত তা হলে সরকারী প্রকল্পগুলোতে ভরতুকি কেন দেবে?—না দিলেও তো বলার কিছু নেই।

বললাম, ভরতুকির অর্থ জনসাধারণের টাকা দিয়ে সরকারী প্রকল্পকে চালু রাখা। আমরা যখন সমাজতন্ত্রের কথা বলি তখন সমাজতন্ত্রের ডেফিনেশনটা ভুলে যাই। মনে করি সমাজতন্ত্রটা বাত্‌কা বাত্‌। বলেই খালাস। সরকারী প্রকল্পগুলো তো লাভের ব্যবসা নয়, জনহিতকর কার্য। জনহিত করতে সরকারী তহবিল থেকে ভরতুকি দেওয়া হয় অর্থাৎ জনসাধারণের হিত সাধন করতে জনসাধারণই সেই অর্থের যোগান দেয়। তাতে সরকারের চেয়ে জনসাধারণের কৃতিত্ব বেশি। সমাজতন্ত্র তো মুনাফাবাজদের আড্ডাখানা নয়, সমাজতন্ত্র হল মানুষের হিতসাধনকারী একটা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা।

সুকুল কথা শেষ করতে না করতেই টেলিফোনের শব্দ শুনে উঠে গেলাম পাশের ঘরে। ফিরে এসে দেখি সুকুল মনোযোগ সহকারে সংবাদপত্র পাঠ করছে।

দেখেছেন কি বিপদ।

কি বিপদ?

ড্রাগ। ছেলেমেয়ে সমানে হেরোইন খাচ্ছে।

ছেলেরা বোধহয় হিরো হতে চায় আর মেয়েরা হিরোইন। তাই হেরোইনের পুরিয়া এক হাত থেকে আরেক হাতে ঘুরছে।

ঠাট্টা করছেন দাদা! না ভাই। আমরা গণতন্ত্রী। আমাদের কাজ করার অধিকার রয়েছে। অকাজ করার অধিকার রয়েছে। কুকাজ করার অধিকার রয়েছে। কাজের অধিকার আমাদের নওজোয়ানদের হিরো হবার জন্য হেরোইন, নওজোয়ানারা হিরোইন হবার তালিম নিচ্ছে নওজওয়ানদের পাশে বসে হেরোইনের পাউডারের ধূমপান করে। এসবই হল গণতান্ত্রিক অধিকার।

এ সবও ঠাট্টা কথা।

আচ্ছা ভাই সুকুল, কয়েকমাস আগে তোমাকে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়েছিল পুলিশ কোর্টে, এটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। কিসের যেন মামলা?

জাল টাকার। অবশ্য আমার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, তবে পুলিশের সার্চ লিস্টে দস্তখত করেছিলাম সেটাই কনফর্ম করতে যেতে হয়েছিল।

সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!

হ্যাঁ, কয়েক লক্ষ জাল টাকা পুলিশ ধরেছিল। টাকাগুলো আসল-নকল যাচাই করা ছিল খুবই মুস্কিল। বিদেশী কোন রাষ্ট্রে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অবাধে এই নোট জাল করে ভারতে চোরা পথে পাচার করা হয়েছিল। এমন নিখুঁত ছাপা, সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ছিল না এই জালিয়াতি ধরা।

উদ্দেশ্য?

সেটা তো জানিনা। আপনি বলুন দাদা।

ভারতীয় অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। প্রচুর জাল কাগজে টাকা ভারতের বাজারে ছেড়ে দিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে, টাকার দাম কমে যাবে।

সর্বনাশ।

হাঁ এই সর্বনাশ ঘটে থাকে বৈরী দেশের সহায়তায়। অনুরূপ ঘটনা

ঘটেছিল চিয়াং কাইশেকের চীনে। এক ব্যাগ নোট নিয়ে যেতে হত এক ব্যাগ চাল কিনতে। এই ভাবে অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল চীনে, তারই আরেকটি প্রয়োগক্ষেত্র হয়েছে ভারতবর্ষ। আবার যে কোন দেশের সম্পদ হল যুবশক্তি। এই যুবশক্তিকে দুর্বল করার পদ্ধতি নানা ভাবে দেখা দেয়। বেকার সমস্যা বড় কঠিন সমস্যা। যুবশক্তিকে বিপথগামী করতে এই সমস্যাকে মূলধন করে থাকে অনেকেই। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি যত অপকাণ্ড ঘটে থাকে তাতে থাকে বেকার জীবনের অভিশাপ।

বিশ্ব হেরোইন নিয়ে আপনার মত কি একই রকম।

বললাম, শোন, যুবশক্তিকে চিরতরে অক্ষম করে দিতে পারে এই সব ড্রাগ।

যে ভাবে ভারতের যুব সম্প্রদায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই সর্বনাশা নেশার কবলে পড়ছে তাতে এই সম্প্রদায়ের কর্মক্ষমতা যেমন লোপ পাচ্ছে তেমনি অকালে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। হতাশা, বেকারত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই যুবশক্তিকে এই ভয়ঙ্কর পথে টেনে নিয়ে চলেছে। এই কাজ করছে উদ্দেশ্য মূলক কোন প্রতিবেশী বৈরী রাষ্ট্র। তাদের এক ডজন ট্যাঙ্ক দিয়ে যুদ্ধ জয়ের আশা যতটা কম তার একশত গুণ বেশি আশা রয়েছে যুদ্ধ জয়ের হেরোইনের পুরিয়াতে আর জাল টাকাতে।

লোকপ্রবাদ পেন ইজ্ মাইটিয়ার দ্যান্ সোর্ড। এখন দেখছি ওয়ান পুরিয়া ইজ্ মাইটিয়েস্ট দ্যান্ এনি থিং!

হাঁ ভাই, হাঁ। আমরা গণতন্ত্রী। কিন্তু এই তন্ত্রটা গৌণ, আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, এই স্বাধীনতা ভোগ করতে দেশ জাহান্নমে ডুবছে। এর বেশি আর কি হতে পারে।

॥ পাঁচ ॥

ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের যে কয়টি ভারতীয় বিশেষ দাপটে ভারত শাসন করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন তাঁদের অন্যতম হল পারাক্কম কে পদ্মনাভন।

আর ভারতীয় প্রশাসনিক সার্ভিসের প্রথম যে কয়েকজন নব সুযোগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত তাঁদের অন্যতম অধ্যাপক (প্রাক্তন) বলবীর রাম তেওয়ারী ছিলেন আত্মবিশ্বাসে এবং পদমর্যাদায় সজাগ।

পদ্মনাভন চেয়ার খালি করে কমিশনার আর তেওয়ারী অতিরিক্ত কালেকটার থেকে জেলা কালেকটরের চেয়ারে সবেমাত্র পাকা পোক্তভাবে গদীয়ান হবার পরের ঘটনা।

বিভাগীয় কমিশনার পদ্মনাভন আর তাঁরই এলাকার একটা ছোট জেলার কালেকটার তেওয়ারী। ক্ষমতার দিক থেকে পদ্মনাভনের চেয়ে তেওয়ারী অধিক শক্তিশালী। তার কারণটা সবাই জানেন, কারণ কালেকটরের সঙ্গে জনসাধারণের যতটা যোগসূত্র অতটা যোগসূত্র নেই কমিশনারের সঙ্গে। তাই নীচু পদের তেওয়ারা নিজেকে মনে করতেন অধিক ক্ষমতাবান।

তেওয়ারী বলতেন, কমিশনার হল পোস্ট অফিস। আমরা যা রিপোর্ট করব তা সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। মাইনেটা একটু বেশি পায় বটে কিন্তু ক্ষমতার ঘরে আছে ঢুঁঢুরাম।

পদ্মনাভন বলেন, ওরা তো পুঁটি মাছ। ছটা জেলার মালিক আমি। যে কোন সময়ে ওদের হেস্তনেস্ত আমি করে দিতে পারি।

অবশ্য পদ্মনাভন আর তেওয়ারীর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না, থাকার কথাও নয়। আমার মত দীনাতিদীন ব্যক্তি সমাজে ঘোরাফেরা করে থাকে লাট্টুর মত। একজন দম দিয়ে ছুড়ে দিয়ে লেত্তিটা তুলে নেয়, যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ বোঁ বোঁ করে লাট্টু যেমন ঘোরে আমিও তেমনই ঘুরি। দম শেষ হলেই কাৎ হয়ে জমিতে গড়িয়ে পড়ি।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল অন্য রকমে।

আই-সি-এস (অর্থাৎ সে সময়ে) এবং আই-এ-এস বর্তমানে ছিল আমাদের ভাগ্যবিধাতা।

শোনা যায় শিশু জন্মাবার পর ষষ্ঠীর দিন বিধাতাপুরুষ এসে শিশুর কপালে ভবিষ্যত জীবনের ভালমন্দের হিসাব নিকাশ লিখে দিয়ে যান। তাই শিশু বড় হয়ে যখন ভাল মন্দ কিছু ভোগ করে তখন আমরা উর্দ্ধবাহু হয়ে বলে থাকি এ সব ভাগ্য তথা বিধাতার দান। কিন্তু রাষ্ট্রের জবরদস্ত প্রতিনিধিরা যে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে তা জানলাম কেরোসিন কিনতে গিয়ে যখন লাইন দিতে হল।

এটা হাসির কথা নয়।

আগের মন্ত্রী কেরোসিন তেল দিতেন তখন যাও বা পাওয়া যেত কিন্তু নতুন

মন্ত্রী আসার পর তেল বাজার থেকে উধাও।

তেল চাই, চিৎকার শোনা গেল সর্বত্র।

তেলের জন্য বসিরহাটের ছাত্ররা প্রাণ দিল তবুও তেল পেল না।

এবার কিন্তু উল্টোরথ। এতকাল সোজা চলতে চলতে হঠাৎ উল্টোপথ ধরল বিক্রেতারা। তখন নিরুপায় হয়ে সবাই ছুটল জেলা কালেকটারের কাছে। সাহেব শুনলেন, হেসে বললেন, স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাতো জানেন। শিশু রাষ্ট্রকে বিব্রত করা চলবে না।

বললাম, তা হলে কেরোসিন পাওয়া যাবে না?

তাতো বলছি না, একটু ধৈর্য ধরতে হবে, সবুরে মেওয়া ফলে, এটা তো জানেন। আপনি প্রবীণ ব্যক্তি। এই প্রখর খরায় কি করে এলেন?

আসতে বাধ্য হলাম, কিন্তু স্যার এ স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি।

সাহেব আবার হেসে বললেন, আপনারা না চাইলেও যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাতো পালিয়ে যাবে না, যেতেও দেওয়া হবে না। একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। শীগ্‌গীরই সাপ্লাই এসে যাবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।

যে সব কথা বলার ছিল তা বলা হয়নি।

গেলাম পদ্মনাভনের দরবারে।

প্রথম প্রশ্ন, কি চাই?

কেরাসিন।

আমি তো কেরাসিনের ডিলার নই।

বললাম, তা জেনেই এসেছি। আপনি নির্দেশ দিলে সাপ্লাইটা পাওয়া যেত।

ওটা আমার ব্যাপার নয়, মিস্টার তেওয়ারীর কাছে যান।

তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছেন।

এটা আমারও কথা।

ফিরে আসতে হয়েছিল। তবে তাদের কথা ভুলিনি।

দৈব আমার সহায়। পেয়ে গেলাম সুযোগ। সুযোগটা যেন পায়ে হেঁটে এসে গেল।

নির্ঝরশীতল সমাদ্দার সপরিবারে ফ্ল্যাট খালি করে চলে গেছে।

নতুন সরকারী ভাড়াটিয়া জ্ঞানবর্ধন মিত্র লট বহর নিয়ে এলেন ফ্ল্যাট দখল নিতে। আমি নিকট প্রতিবাসী তাই আলাপ জমাতে এসে তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে গেলেন।

কয়েক ঘণ্টা বাদেই দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ।

দরজা খুলে পেলাম যাঁকে তিনিও ভাড়াটিয়া। অর্থাৎ পাশের ফ্ল্যাটের নতুন অন্য ভাড়াটিয়া। তখন এসেছেন ফ্ল্যাট দখল নিতে। সব শুনে বললাম, কোথাও ভুল হয়ে গেছে মশায়। ও ফ্ল্যাট আর খালি নেই। জ্ঞানবর্ধনবাবু দখল নিয়েছেন ঘণ্টা খানেক আগে।

সে কি মশায়। আমাকে অর্ডার দিয়েছেন স্বয়ং কালেকটার সাহেব। এ হতে পারে না।

জ্ঞানবর্ধনবাবুকে ডেকে আনলাম।

কি ব্যাপার বলুন তো ?

আমিও ভাবছি, কি ব্যাপার। স্বয়ং কমিশনার সাহেব অর্ডার দিলেন লিখিতভাবে অথচ দেখছি দাবীদার দুজন। কিছুই বুঝতে পারছি না দাদা।

জ্ঞানবর্ধন আর বিপ্লব সেনগুপ্ত নিজেদের মধ্যে মীমাংসায় বসলেন।

কালেকটারও সই করে মোহর দিয়েছেন, আবার কমিশনারও সই করে মোহর দিয়েছেন। কারও দাবী কম নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি সই করার সময় ছিলেন ?

না মশাই, ওটা কালেকটারের খাস কেরাণী করিয়ে দিয়েছে তবে নগদ আটশ' টাকা দিতে হয়েছে তাকে। বলেই থামলেন জ্ঞানবর্ধনবাবু।

বিপ্লব সেনগুপ্ত একই সুরে বললেন, কমিশনারের পি-এ করে দিয়েছেন, দক্ষিণা দিতে হয়েছে দেড়হাজার টাকা।

তারপর ?

তারপর এই সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার। আমি যাচ্ছি থানায়। কমিশনারের অর্ডার দেখিয়ে সাহায্য চাইব।

জ্ঞানবর্ধনবাবু বিক্ষুব্ধভাবে বললেন, পুলিশ ফুলিশ আমি বুঝি না। তাদের সাহায্য চাইলেই এবার আটশত থেকে আটহাজারে উঠতে হবে। তার চেয়ে

সোজা আদালতে। পয়সা দিতে হয় উকিলকেই দেব। রেস্টেন অর্ডার আনবই আনব।

এতে তো হাঙ্গামা বৃদ্ধি পাবে। একটা কাজ করুন। কাউকেই পুলিশে বা আদালতে যেতে হবে না, বরং ঘরে ঘরে মীমাংসা হবে। আজকাল তৃতীয় পক্ষের আমদান, ঘটলেই হাঙ্গামা বৃদ্ধি পায়। সমস্যা সমাধান হয় না। দ্বিপাক্ষিক আলোচন করে স্থির করুন, কার প্রয়োজন বেশি। যার প্রয়োজন বেশি তাকে ফ্ল্যাটটা দিন, সঙ্গে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঘুষের টাকাটা ফ্ল্যাট প্রাপকের কাছ থেকে নিয়ে নিন।

জ্ঞানবর্ধনবাবু বললেন, মনে করুন আমি ফ্ল্যাটটা নিলাম, তার বদলে ওঁকে দিতে হবে দেড়হাজার টাকা, এটা কি যুক্তিযুক্ত। আবার ঘুষের অঙ্কটা কেইশশ'-তে দাঁড়াল। এটা কি সম্ভব!

তাহলে আপনারা দুজন সোজা চলে যান কমিশনার সাহেবের কাছে।

তা মন্দ নয়। শুধু কমিশনার নয় কালেকটার সাহেবের কাছেও যাব আমরা।

সুফল হলেই ভাল। যিনি রণে পরাজিত হবেন তাঁর দেওয়া ঘুষের টাকা আর ফিরে পাবেন না। আমার হিসাবে একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, অবশ্য ঘুষের অঙ্কটা করবে, বৃদ্ধি পাবে কিন্তু একটি পক্ষ ফ্ল্যাট না পাওয়ার জন্যই আপশোষ ঘুষের টাকার জন্য নয়। আর যিনি পাবেন তিনি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবেন, ঘুষের টাকার দুঃখ তাতেই ঘুচবে।

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, অসম্ভব।

তাহলে চলুন।

জ্ঞানবর্ধনের মাল রইল আমার ঘরের ভেতর আর বিপ্লবের মাল রইল ঘরের বাইরে। জ্ঞানবর্ধনের স্ত্রী ও একটিমাত্র বয়স্কা কন্যা এসে আশ্রয় নিলেন আমার খাবার ঘরে আর বিপ্লবের জোয়ান ছেলের সঙ্গে তার মা ও পিসিমা এসে বসলেন আমার বৈঠকখানা ঘরে।

চা খেয়ে বেরিয়ে গেল দুই দাবীদার।

কাজের লোকটাকে বললাম, চা, আর কিছু ভাল বিস্কুট দিতে বলে আর বাদল মিস্তিরিকে। যা তাড়াতাড়ি।

গেরো কম নয়। সেই সকাল নটায় গেছেন দুই দাবীদার। একটা বাজতে

চলল, অথচ কারও দেখা নেই। এতগুলো লোক অভুক্ত আমার ঘরে। ব্যবস্থা করার উপায় নেই। কারণ আমার ঘরে কোনদিনই উনুন জ্বলে না। আমি নিজেই অন্নের প্রত্যাশী, অন্ন বিতরণ কি করে সম্ভব হবে। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, আপনাদের তো খাওয়া হয়নি। কতক্ষণ যে কর্তারা আসবেন তাতো বুঝতে পারছি না। ওঁরা আসবার আগেই, কিছু মুখে দিয়ে নিন। বেশি দেরী হবে না। কাছেই হোটেল। খবর পেলেই রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে খাবার নিয়ে আসবে।

জ্ঞানবর্ধনের স্ত্রী সামান্য একটু ঘোমটা টেনে মেয়েকে বলল, ভদ্রলোককে বলে দে, আমরা খেয়েই এসেছি।

বললাম, তাকি হয়। গেরস্ত বাড়িতে উপোস থাকবেন তাতো হতে পারে না। বিপ্লবের স্ত্রীকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে কাজের লোকটাকে হোটেলে পাঠালাম।

হোটেল থেকে খাবার আসতেই টেবিলে দুপক্ষকে পাশাপাশি বসিয়ে আমি গেলাম স্নানে। ওরা তখন খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত।

সবে মাত্র খাওয়া আরম্ভ হয়েছে, তখনও আমি বাথরুমে।

এমন সময় জ্ঞানবর্ধন ও বিপ্লব দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

সবারই চোখে প্রশ্ন, কি হল ?

মুখে প্রশ্ন করল বিপ্লবের স্ত্রী।

কথা বলছ না কেন ? কি হল। কি বলল সাহেব ?

কচু !

মানে, কারও কপালে নেই। ফ্ল্যাট আটক করার হুকুম দিয়েছে কালেকটার সাহেব। পুলিশ আসছে দরজায় তালা দিতে।

বাথরুম থেকে বেরতে বেরতে শেষের কথাটা কানে গেল। তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, দরজায় তালা দেবে কেন ?

কাউকেই ফ্ল্যাট দেবে না। বলল, ডিস্‌পিউট। এ ভাবেই সমস্যার সমাধান।

ঠিক বুঝলাম না।

বিপ্লব সেনগুপ্ত বলল, কমিশনার সব শুনে গুম হয়ে বসলেন। শেষে বললেন,

তেওয়ারীর একটু বাড় বেড়েছে। ওপরওলাকে গ্রাহ্যও করে না। আপনারা তেওয়ারীর কাছে যান, আমি ফোনে তার সঙ্গে কথা বলছি।

তারপর?

তারপর গেলাম কালেকটরের কাছে। কালেকটার সাহেব বলল, ওই তেঁতুলে বেটার কোন এক্তিয়ার নেই য়্যালটমেন্ট দেওয়ার। আমার জুরিসডিকশনে কমিশনার কেন নাক গলায় তা বুঝি না। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ফোনে ফিস্ ফিস্ করে কি কথা হল তা জানি না। তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, কমিশনার সাহেবের ওপরওলার নির্দেশ এসেছে। খালি ফ্ল্যাট য়্যালট্ করবেন মন্ত্রী স্বয়ং। এখুনি তাঁর পি-এ-র ফোন পেলাম। মনে হয় এটা তেঁতুলে ব্যাটার কারসাজি। এতদিন তো এই ক্ষমতাটা ছিল কালেকটারের। হঠাৎ মন্ত্রীরা নাক ঢোকাবে এটা ভাবাও যায় না। আজকাল সব কাজেই মন্ত্রীরা নাক ঢোকায়। এটা এমন কিছু নয়, তবে এই কাজটা করেছে ওই তেঁতুলে ব্যাটা। আচ্ছা দেখে নেব। সব শুনে ফিরে এলাম। আমার দেড় হাজার ওর আটশ'। ন দেবায় ন ধর্মায়। এখন বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাই বলুন তো।

হেসে বললাম, আপাতত আমার গৃহে থাকুন। এই জন্যই বলেছিলাম, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে স্থির করুন কার প্রয়োজন বেশি। যার প্রয়োজন বেশি তিনি-ই ফ্ল্যাটটা নিন। যাক্, সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেছে। আর মন্ত্রীদের কথা বলছেন। ওরা তো মন্ত্রী হয়ে জন্মায়নি। ওদের মন্ত্রী হবার আমরাই সুযোগ দিয়েছি। ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যাদের ঘুরতে দেখেছেন, তারা এখন এইচ্-এম্। মাননীয় মন্ত্রী। উপোষী লোক সামনে এত ভোগ্য সম্ভার তাই ভারসাম্য রাখতে পারছে না। উপরন্তু ওদের ক্ষমতা রক্ষা করতে হয় আমলা আর পুলিশের দয়াতে। তাই কমিশনার সাহেব কালেকটারকে ফোন না করে খোদ মন্ত্রীকে ফোন করেছিল। তারই ফল তো দেখলেন। এবার আপনারা খেয়ে দেয়ে নিন। পরে সব ভেবে চিন্তে ঠিক করবেন।

জ্ঞানবর্ধনের গৃহিণী অষ্টাদশী মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তখনই বলেছিলাম, জেলা শহরে ট্রান্সফার নিও না। মাথা গোঁজার জায়গা পাবে না। বাবু তা শুনলেন না, এখন বোঝ মজা। এখানে ফুটপাতও নেই। গাছ তলাতেই পড়ে

থাকতে হবে।

পারিবারিক কোঁদলে কান না দিয়ে আমি ওঁদের বসবাসের মত সাময়িক ব্যবস্থা করার দিকে নজর দিলাম।

কয়েক মাসের মধ্যেই জ্ঞানবর্ধন ও বিপ্লব প্রাইভেট বাসা ভাড়া করে উঠে গেল।

স্বকুল একদিন এসে বলল, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব সব চলে গেছে তা হলে?

মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ। আপাততঃ। ফিরে আসতেও পারে।

অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু যা শুনলাম, তাতে তো নিজের উপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি।

তা বটে। তবে কি জান ভাই, চাকরি মানেই চাকরের কাজ। কেউ কলতলায় বাসন মাজে, কেউ চেয়ারে বসে হুকুম করে। নেট ফল হল ওরা সবাই চাকর। মনিবকে খুশী রাখাই ওদের কাজ। একটা চাকর মনে করে অপর চাকর থেকে আমি কিসে ছোট। তাই খেঁকী কুকুরের মত নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি করে।

ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার পর নির্ঝরশীতল সমাদ্দার অনেক দিন আসেনি। হঠাৎ সেদিন এসে হাজির। তার দিকে তাকিয়ে স্বকুল বলল, এঁকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

তা হবে। আমার পাশে ফ্লাটে থাকতেন অধ্যাপক নির্ঝরশীতল সমাদ্দার। কেমন আছেন প্রোফেসার মশায়?

ভাল, আবার ভাল নয়।

আপনার কথায় কেমন হেঁয়ালির গন্ধ! কিসে ভাল, আর কিসে ভাল নয় সেটাই বলুন।

ভাল সংবাদ হল আমার স্ত্রী সাবলীলা রায়সমাদ্দারের সন্তান সম্ভাবনা।

এতো খুশী কা বাত্।

মন্দ হল, ডাক্তারের অভিমত। মা হবার বয়সটা নাকি পেরিয়ে গেছে। বেশি বয়সে প্রথম সন্তান প্রসব নাকি খুবই কষ্টকর হয়। তাই ভাবছি।

ডাক্তারদের মতামত শুনে চলতে বলুন। ভয়ের কোন কারণ নেই।

অবাক হয়ে টানা টানা চোখ দুটো উঁচু করে বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই! আমি তো ভেবে অস্থির। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারি না।

এবার থেকে ঘুমোতে পারবেন। বলুন, আপনার থিসিস সাবমিট্

করেছেন কি ?

আর থিসিসের দরকার নেই দাদা। এবার সাবলীলা রায় সমাদ্দারকে নিয়েই থিসিস লিখতে হবে। আজকাল উনি পার্টি করছেন। তাতেই চিন্তিত হয়ে পড়ছি বেশি। এই অবস্থায় ছুটোছুটি করাটা কি ভাল। অনেক বুঝিয়েছি। তবুও ছুটছে। তাই আপনার কাছে এলাম। কোন রকমে যদি তাকে নিবৃত্ত করতে পারেন তা হলে চিরকাল আপনার বান্দা হয়ে থাকব।

কাজটা বড়ই কঠিন।

তা জেনেই তো এসেছি। আপনিও তো পার্টি করেছেন। এখন তো একেবারে নির্বিকার।

বললাম, তার কারণটা বোধহয় জানেন না। আমরা ছিলাম আদর্শের পূজারী। আমরা লড়াই করেছি আদর্শকে সামনে রেখে। দেশ স্বাধীন হল : এবার দেশ গড়বার পালা।

সুকুল বাধা দিয়ে বলল, দেশ গড়তে কতটা পেরেছেন ?

একা তো কিছু করাই সম্ভব নয়। যারা ছিল সঙ্গী সাথী তাদের ধীরে ধীরে হারাতে থাকি। সহজ করে বললে বলব, ওদের যেদিন দেখলাম আদর্শ ত্যাগ করে বিপথে চলছে তখন ওদের কাছ থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম। এমন ঘটনা তো আপনার জীবনে কখনও ঘটেনি, তাই নির্বিকার হতে পারেন নি। একসময় ছিল দেশকে ভালবাসা অপরাধ। সেই অপরাধের মাশুল দিয়েছে লক্ষ লক্ষ আমার মত লোক। নির্ভুল আদর্শ-ই সত্য। সেই সত্যকে অস্বীকার করে ওরা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে ! তাই ওদের হারিয়েছি পালানোর গৌরবে।

নির্ঝরশীতল সমাদ্দার চুপ করেই ছিল।

সুকুল বলল, আপনার কথাগুলো বড়ই রুঠো রসকষহীন।

বললাম, বোধহয় তাই। সত্যের প্রকাশ মিষ্ট ভাষায় সম্ভব হয় না সব ক্ষেত্রে।

নির্ঝরশীতল ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল।

দরজা খুলে ঢুকল চিন্তামণি।

আরে চিন্তামণি যে, কবে আসলে। বস বস।

চিন্তামণি বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন ছিলে ?

ভাল, খুব ভাল। পৃথিবীর ঝড় ঝাপটা, ভালমন্দ, কলহ বিসম্বাদ, মায়া, মমতা, প্রেম ভালবাসা এতকাল ছিল অজানা। সব থেকে মুক্ত ছিলাম দাদা। তবে দুঃখ একটা ছিল।

এখন তো নেই ?

আছে। থাকবেও চিরকাল। অপরাধ না করেও অপরাধী হয়ে সুদীর্ঘ তিন বছর জেল খেটে এলাম, এতে দুঃখ নেই। দুঃখ হল যারা পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দিয়ে দেশকে ধন্য করবে বলে গাল ভরা মিঠে কাহিনী শুনিয়েছিল তারা কতটা অপরিচ্ছন্ন তা এখনও লোকে ভাল করে জানে না। এইটেই বড় দুঃখ। এই দুঃখই থেকে গেছে আজও।

বললাম, ধীরে ধীরে লোকে জানবে।

অশ্বডিম্ব। দু চারজন জানলেও বাকি লোকদের জানবার সুযোগ ওরা দেবে না!

আজ সারা দুনিয়াতে চিৎকার শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই যুদ্ধও ব্যাপক ভাবে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, অথচ শান্তিও বিন্দুমাত্র কায়েম হয়নি। এই ভাবে লোকের সামনে যুদ্ধের বিভীষিকা তুলে ধরে আতঙ্কিত যারা করছে তারা জানে যুদ্ধ তাদের কাছে কামধেনু হয়ে দেখা দেবে। শান্তির জন্য মেকি চিৎকার করে শান্তিকে কোথায় নির্বাসন দিচ্ছে তা আমরা কেউ কি জানি!

এসব বড় বড় চিন্তার জন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। তোমার কথা বল চিন্তামণি।

আমার কথা আমার নামে। যে খায় চিনি জোগায় চিন্তামণি। আমি সবাইকে দেই, আমাকে দেবার লোক দরকার হয় না। এটাই আমার কথা।

আজও তুমি মনে কর বিনা অপরাধে জেল খেটে এলে।

নিশ্চয়। আজ মিথ্যাচারের প্রয়োজন আছে কি? একই অপরাধে দুবার তো শাস্তি হয় না। আমি চেকে দস্তখত করিনি।

তাহলে দস্তখত কার? নিশ্চয়ই তোমার কোন সহকর্মীর।

তাও বলতে পারব না। আমার সই জাল করেই টাকাটা তোলা হয়েছিল,

এটাই সত্য কথা। একটা চক্রান্ত চলছিল তার গন্ধ পেয়েছিলাম কিন্তু সতর্ক হইনি এটাই অপরাধ।

কিন্তু টাকাটা কে তুলল ব্যাঙ্ক থেকে তাও নিশ্চয় করা যায়নি। চেক বইটা কি করে অন্যের হাতে গেল তাও জানা যায়নি। সবই যেন ধাঁধা।

কিন্তু হস্তাক্ষর বিশারদরা বলেছেন, ওই সই আমার। ওটা জাল সই নয়। জজসাহেব বিশ্বাস করলেন। এগার হাজার টাকা তছরূপের দায়ে জেল দিলেন। এগার হাজার টাকা অতি সামান্য টাকা। আমিও আর বার চোদ্দ বছর চাকরি করলে কয়েক লক্ষ টাকা পেতাম মাইনে খাতে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেও কয়েক লক্ষ টাকা পেতাম। এই লক্ষ লক্ষ টাকার আশা ছেড়ে এগার হাজার টাকাটাই কি বড় হল! চোরাই টাকা ব্যয় করতে হলে মেয়ের বিয়ে গৃহিণীর গহনা ইত্যাদিতে অথবা মদ মেয়ে মানুষের জন্য দরকার হত। এসব কিছুই তো আমার দরকার ছিল না। বিয়ে করিনি। বউ ছেলে-মেয়ে নেই। পান সিগারেট মদ খাই না, মেয়েমানুষকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলি। এত জানা সত্ত্বেও আমি দোষী প্রমাণিত হলাম সইয়ের জন্য। জ্ঞানমত বলতে পারি, ওই সই আমার নয়।

কেন তোমার সহকর্মীরা এই চক্রান্ত করল। তোমার শত্রু কে?

আমার শত্রু আমার উপরওলা, ভগবান নয়।

উপরওলাই বা শত্রুতা করবে কেন?

সেটাই তো আসল কথা। উপরওলার ছেলে বি-এ পড়ত। হঠাৎ দেখা গেল তাকে মেডিকেল কলেজে। এই ছেলেটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দিয়ে শোচনীয়ভাবে ফেল করেছিল। সে পড়তে গেল বিজ্ঞান, কলেজ কর্তৃপক্ষ সায়েন্স পড়ার অনুপযুক্ত মনে করে তাকে দিল আর্ট পড়তে। হাজার হোক উপরওলা তো। এই অবমাননা সহ্য হবে কেন? সে তার উপরওলা যার ওপর আর কেউ নেই তাকে গিয়ে ধরল। বলল, স্যার আপনার কোটাতে আমার ছেলেকে ভর্তি করে দিন কোন মেডিক্যাল কলেজে। স্যারকে তার সংসার রক্ষা করতে এই উপরওলার সহযোগিতা চাই সর্বক্ষণ। আবেদন মঞ্জুর হল। উপরওলার ছেলে ডাক্তারী পড়তে গেল। এই খবরটা সবাই জানত না। জানতাম আমরা ক'জন। উপরওলার ধারণা এই খবর আমি দিয়েছি জনসাধারণকে। অর্থাৎ আমার অপরাধ অমার্জনীয়।

কিন্তু সর্বোচ্চতলার মানুষরাই নাকি পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, পরিচ্ছন্ন করতে চায় প্রশাসন।

ওটা কথার কথা। আসলে কেউ ক্লিন নয়। আর একটা অপরাধ করেছিলাম, বলেছিলাম এই সব ছেলে ডাক্তার হবে অথবা খুন করার লাইসেন্স পাবে সেটাই বিবেচ্য।

বললাম, কোন রকমে মেডিক্যালের 'ক্যাচ' যদি তোমার উপরওলা আয়ত্বে আনতে পারে তা হলে এই ছেলেই যাবে বিলেতে ডিগ্রী আনতে। ফিরে এসে হবে হেলথ সার্ভিসের হোমরা চোমরা। তোমার কপালে রয়ে গেল কর্মচ্যুতি, অর্থনাশ ইত্যাদির সঙ্গে তিন বছরের জেল।

যা বলেছেন দাদা। কিন্তু আমার আপশোষ নেই। বামুনের ছেলে দেশে গিয়ে যজমানী করে খাব। আমার তো কোন বন্ধন নেই। চলে যাবে কোন প্রকারে।

চিন্তামণি সত্যিই চিন্তামুক্ত কিনা বোঝা গেল না। তবে বুঝলাম অমিত মনোবল সম্পন্ন এই ব্যক্তি। ভাঙবে তবু মচকাবে না। মনে মনে প্রশংসা করলাম।

চিন্তামণি চলে যাবার পর মুকুল বলল, ব্যাড লাক্।

না। গুডলাক্। চিন্তামণি নিজেকে চিনতে শিখেছে ও পেরেছে। ওর উপরওলা যেদিন নিজেকে চিনতে শিখবে এবং পারবে সেদিন খুবই বিলম্ব হয়ে যাবে, সেদিন আর নিজেকে ফিরে পাবে না, বিবেকের দংশনে মরতে হবে। প্রবোধ দেবার কাউকে খুঁজে পাবে না।

এতো মুনি ঋষির মত কথা হল দাদা। ইহকাল পরকালের খেলা। ইহজন্ম আর জন্মান্তরের কথা। ওসব নীতিবাক্য আজকার যুগে অচল।

তা বটে। আজ টাকাই হল মানুষের সব। যে কোন উপায়ে টাকা রোজগারের ধান্দায় টাকার পেছনে ছুটছে। সে টাকা সৎপথেই আসুক আর অসৎ পথেই আসুক তাতে ক্ষতি নেই, টাকা চাই। এক কাবলিওলা দেনাদারের কাছে গেছে টাকা আদায় করতে। দেনাদার টাকা দেবার লোক নয়। যতবার সে বলে খাঁ সাহেব টাকা নেই, আগিলা মাহিনামে দেগা। ততবারই কাবলিওলা বলে, রুপি দেও, তারপর ?

পরের ঘটনা লড়াই অথবা অবমাননা।

সবার একই কথা, টাকা চাই। পরের ঘটনাকে কেউ পরোয়া করে না।

স্বকুল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল।

জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলতে চাও ভাই ?

অনেক কিছু কিন্তু আজ আর বলব না দাদা।

মনের কথা মনে রেখে গুমরে মরা ভাল নয়। ওসব থাক্। তোমার ছেলের চাকরি হয়েছে ?

স্বকুল হেসে বলল, আপনি সন্টলেকে জমি পেয়েছেন ?

কেন বলত ?

আপনার যা অবস্থা, আমারও একই অবস্থা। আপনি সুপারিশ নিয়ে দরখাস্ত করলেন। দেখা করলেন উপরওলার সঙ্গে। খাতির করলেন উপরওলা। আপনাকে ভাঁড়ের বদলে কাপে করে চা খাওয়ালেন। উপরওলা কি বললেন ? আপনার কাছে চিঠি যাবে। তারপর আট বছর কেটে গেছে। চিঠি পেয়েছেন ? কিন্তু আট বছরে আটশ প্লট বিলি হয়ে গেছে। মুরুব্বীর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার সম্পর্কটা আপনি ভুলে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন পরিচ্ছন্ন প্রশাসনে আপনার ভাগ্য খুলবে। হয়েছে কি ? আমার ছেলেও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের প্যানেলে আছে। শুনছি, পুরানো প্যানেল ক্যানসেল করে নতুন প্যানেল হবে।

কিন্তু নিরুপমের কাজটা তো হওয়া উচিত ছিল। যোগ্য প্রার্থী।

স্বকুল হেসে বলল, অযোগ্য প্রার্থী, কেননা তার নিজস্ব কোন পয়সা নেই, তার বাবার ট্যাকও খালি। ইংরেজ আমলে ভেরিফিকেশন ছিল, তখন দেখা হত প্রার্থীর রাজনৈতিক চরিত্র। এখন সে বালাই নেই কিন্তু ভেরিফিকেশন আছে। কেন ? যারা ভেরিফাই করবে তাদের সরকারী বেতনে আর সংসার চলছে না। তাই ভেরিফায়েড যুবকের পকেট কাটতে হবে, সেই সুযোগটা পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ওদের দিয়েছে।

আমি চুপ করে গেলাম।

স্বকুল বলল, আমার ছেলের ব্যাচে যারা ছিল প্যানেলে তাদের কেউ কেউ জুতো চোর, লুটেরা, কেউ কেউ বোমা বিশারদ কিন্তু তাদের পকেটে রেস্ত থাকায় ভেরিফায়েড এবং যথাসময়ে অ্যাপয়েন্টেড। এটাই তো পরিচ্ছন্ন প্রশাসন। ইংরেজ যখন বাংলা দখল করেছিল তখন ডবল গভর্ণমেণ্ট চালু হয়েছিল। টাকার মালিক ছিল ইংরেজ আর প্রশাসন চালাত নবাব। বর্তমানের সেই ডবল

গভর্ণমেণ্ট চলছে। টাকার মালিক দিল্লীর সুলতানরা আর প্রশাসনের মালিক হল পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক জন নির্বাচিত নেতারা।

যাক ওসব কথা, চা খাবে?

মন্দ নয়। তবে শেষ কথাটা শুনুন, আপনি সণ্টলেকের জমি না পেলেও আপনার নাম কিন্তু লেখা হয়েছে পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের খাতায়। কেবলমাত্র দুটো ভুল থেকে গেছে। আপনার বাবার নামটা নেই আর ঠিকানাটা আলাদা। আপনি উর্ধ্ববাহু হয়ে প্রশাসনের জয়গান করার অধিকারী।

কাজের লোকটা গেল চা আনতে। বাদল মিস্তিরির খাড়ু চায়ের ভাঁড় নিয়ে কিছু ক্ষণের মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করতেই আমাদের আলোচনা থেমে গেল।

নিষ্ঠার সঙ্গে চা পান করে সুকুল বলল, আজ চলি।

॥ ছয় ॥

চিন্তামণি এসেছিল অনেকদিন পর। সঙ্গে তার স্ত্রী অনুপমা।

অনুপমা স্কুলের শিক্ষিকা। চিন্তামণি জেলে যাবার আগেই পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা হয়নি। চিন্তামণি ফিরে এল জেল থেকে। অনুপমা যেচে গিয়ে দেখা করল তার সঙ্গে।

চিন্তামণি বিশেষ বিব্রতবোধ করে বলেছিল, তুমি কেন দেখা করতে এসেছ?

অনুপমা গম্ভীরভাবে বলল, এতে কোন অন্যায় আছে কি?

জানি না। তুমি তো জান তহবিল তছরূপের দায়ে আমার তিন বছর জেল হয়েছিল। সমাজে আমার স্থান হল সমাজবিরোধীদের তালিকায়। আমার কাছে আসাটা তোমার গৌরব হানি ঘটাবে। লোকে নিন্দা করবে।

নিন্দা কুড়িয়ে মাথায় নেবার জন্যই এসেছি। গৌরবের ডেফিনেশনটা আমার জানা নেই।

চিন্তামণি অবাক হয়ে গেল।

অনুপমা বলল, যে লোক বিনা অপরাধে জেল খাটে তাকে নির্বোধ বলাই উচিত কিন্তু সেই নির্বোধ লোকটি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই যখন জেনেছি

তখন নির্বোধকেও মানুষ বলেই মনে করেছি। তাই একটা নির্বোধকেও মানুষকে দেখতে এসেছি।

এটা হল গৌরচন্দ্রিকা।

এসব ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

হঠাৎ চিন্তামণি এসে বলল, আজ আমার জন্য ঘণ্টা কয়েক নষ্ট করতে পারবেন কি?

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না ভাই।

আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে। দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন।

রাজি হয়ে গেলাম।

কাপড় জামা বদলে তার সঙ্গে রাস্তায় এসে দেখলাম, একটা প্রাইভেট কারে একটি মহিলা বসে আছেন। সামনের সিটে মধ্যবয়সী দুজন ভদ্রলোক।

আসুন দাদা, বসুন গাড়িতে, বলে চিন্তামণি গাড়ির দরজা খুলে দিল।

গাড়িতে পা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার বল তো চিন্তামণি?

চিন্তামণি একগাল হেসে বলল, ইনি অনুপমা দেবী। নামকরা বালিকা বিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য-ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ান। থাকেন পাকপাড়ায় পিতৃগৃহে, পিতা গতায়ু কিন্তু মাতা জীবিত এবং স্নেহপরায়ন এবং আমি তাঁর অতি স্নেহভাজন। কৃপা পরবশে শ্রীমতী অনুপমা সরকার আমাকে বিবাহ করতে চান।

অনুপমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, ওর কথা শুনবেন না।

নিশ্চয়ই শুনবেন। কৃপা না করলে কেউ কি তহবিল তছরূপকারী জেল ফেরত আসামীকে বিয়ে করতে চায়? বুঝে দেখুন, আমার কথা সত্য কি না! আমি বহুবার নিবৃত্ত করতে চেয়েছি কিন্তু সফল হইনি। এই দেখুন দুজন সাক্ষী সঙ্গে করে বন্ধুর গাড়িতে চেপে আমার কণ্ঠে, মনে করা যায়, গামছা পেঁচিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। আমি আপনার শরণাপন্ন, এবার আপনি যা আদেশ করবেন আমি নত মস্তকে তা পালন করব।

আর কথা বলার অবসর ছিল না। গাড়িতে অনুপমার পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার, চিন্তামণি আমার পাশে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করল।

সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস।

সহি-সাবুদ ও শপথ নেবার পর আইনসম্মত স্বামী-স্ত্রীর পেছন পেছন মাঝারি সাইজের হোটেলে বসে সেদিনের ভুরিভোজন শেষ করে বিদায় নিলাম, অর্থাৎ আমাকে আমার গৃহে পেঁছে দিয়ে গেল।

রাস্তায় অনুপমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার আত্মীয়স্বজন এই বিবাহে মত দিয়েছে?

অনুপমা বলল, নেবার প্রয়োজন ছিল না। আমি সাবালিকা, মানে প্রৌঢ়ত্বের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আর চিন্তামণি প্রৌঢ় বলা যায়। আমাদের বিষয়ে আমরাই মত দেব। তবুও মায়ের সম্মতি নিয়েছি। আমার পিসতুতো দাদা অবশ্য বলেছিল, অনু তুই শেষ পর্যন্ত একটা চোরকে বিয়ে করছিস। আমি বলেছিলাম, ভারতবর্ষের কটা লোক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে আমি সৎ! পিসতুতো দাদা কাস্টমসে চাকরি করে, বোধ হয় নিজের কথাটা ভেবেই কোন জবাব দিতে পারেনি।

তোমরা কি চিন্তামণির বাড়িতে উঠবে?

আপাতত সেটাই ঠিক, তবে মাকে একলা রেখে যাওয়াটা ন্যায় ধর্ম সম্মত হবে কি? ভেবে চিন্তে মাকেই কাছে রাখব, নইলে দুজনেই মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।

আর কিছু বলার ছিল না।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললাম, তোমরা সুখী হও।

এই ঘটনার অনেকদিন পর এই প্রথম চিন্তামণি অনুপমাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছে। তাদের বসতে দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করলাম।

চিন্তামণি হেসে বলল, দাদার কোন পরিবর্তন হয়নি দেখছি।

মানে, তোমার মত কাউকে গলায় ঝুলিয়ে নেবার সুযোগ পাইনি। এই তো?

ঠিক তা নয়। তবে এত বড় ফ্ল্যাটটায় আপনি একা থাকেন, বড় খালি খালি মনে হয়।

শূন্যস্থান পূর্ণ করার মত মানসিকতা এখনও জন্মায়নি। যদি কখনও জন্মায় তখন তোমাকেও গাড়ি চাপিয়ে নিয়ে যাব।

হাসলাম।

অনুপমা মুখ টিপে হাসল।

কি করছ আজকাল ?

কিছুই করার মত পাইনি। আইন কলেজ থেকে পাশ করেছিলাম। একটা কোম্পানীতে মোটামুটি আর্জি লেখার কাজ সংগ্রহ করেছি। স্থায়ী কিছু নয়। আমার অবস্থা মহাভারতের কর্ণের মত। আমার বাবার আগেই পরিচয় পতাকা চিনিয়ে দেয় আমার অতীতকে। তাই ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়। তবে বর্তমান নিয়োগ কর্তা বড়ই উদার। সব জেনেশুনেই কাজ দিয়েছেন কিন্তু নগদ কড়ির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

ভাল কথা। তবে সুখেই আছ মনে হচ্ছে।

আপনার মনটা দিয়ে আমাকে যাচাই করলে অবিচার করা হবে দাদা। বড়ই দুঃখে আছি দাদা। তাইতো আপনার কাছে এসেছি।

তোমরা দুজনে উপার্জন করছ। আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে বেশ মানসিক শান্তিতেও আছ। যতদূর জানি, তুমি কোন হৈ হাঙ্গামায় কখনও জড়িয়ে পড় না, অথচ দুঃখ কেন ?

কারণ লোভ! অনুর সঙ্গে মাঝে মাঝেই কলহ হচ্ছে। জানেন তো লোভ হল সবচেয়ে সর্বনাশা। অনুর মা হবার লোভ। আমার বাবা না হবার লোভ। এই দুই লোভের সংঘাতে আমাদের কলহ এবং আপনার শরণাপন্ন হতে এসেছি দুজনে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করে। মনে হচ্ছে আপনিই পারবেন এর সমাধান করতে।

হেসে ফেললাম চিন্তামনির ভঙ্গীতে।

অনুপমা এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলল, ওর কথা শুনবেন না। মা হবার লোভ মেয়েদের থাকা উচিত। কিন্তু চিন্তামণি বলছে, আমাদের সন্তানকে লোকে বলবে চোরের সন্তান তাই সন্তান না হওয়াই ভাল।

বললাম, মানুষ বড়ই ভুলো জীব। সময় পেরিয়ে গেলে, সবাই সব কিছু ভুলে যাবে।

সত্যি ? কিন্তু আমার বিশ্বাস, মানুষ অপরের কলঙ্ককে ভুলতে চায় না।

বললাম, তাও আংশিক সত্য। আমার একজন সহপাঠীর বাবা মদ চোলাইয়ের ব্যবসা করত। তিনি নিজেও ছিলেন অত্যাধিক মদ্যপ। খবর পেয়ে

আবগারী বিভাগ থেকে বমাল বন্ধুর বাবাকে গ্রেপ্তার করল। বিচারে তাঁর তিনমাস জেল হল। আমরা ছোট ছিলাম। একদিন দেখলাম বন্ধুর বাবাকে কোমরে দড়ি বেঁধে আবগারী পিওনরা টেনে আনছে। তারপর বিচার ও তিন মাসের মেয়াদ।

তখন আপনার বন্ধুটি কি করল?

সেও আমার মত অল্প বয়সী। করার কিছু ছিল না। তার বাবা জেল থেকে বেরিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে চাষবাসে মন দিলেন। বন্ধুটি স্কুল কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে সরকারী চাকরিতে ঢুকে পড়ল। ছোটখাট চাকরি নয়, একেবারে মুন্সেফ-ম্যাজিস্ট্রেট। এত বড় একটা অফিসারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। উড়িষ্যার একজন বাঙ্গালী ডেপুটি সেক্রেটারীর মেয়েকে বিয়ে করে চুটিয়ে চাকরি করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছে, তার দুটি পুত্রই ইঞ্জিনীয়ার। তারাও বেশ প্রতিষ্ঠিত। বন্ধুর বাবার সেই জেল খাটার রেকর্ড নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। এখন বন্ধুটি মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তি। তোমাদের সন্তানদের সন্তানের মত মানুষ করতে পারলে তোমার জেলখাটার ঘটনা ধামা চাপা পড়ে যাবে। কৃতী সন্তানদের পেছনে ছুটবে অনেক কৃতী কন্যার পিতা, সমাজ তাদের সাদরে বুকে টেনে নেবে।

অনুপমা জোরের সঙ্গে বলল, শুনলে তো।

চিন্তামণি বলল, শুনলাম কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

বললাম, ওটা তোমার ব্যক্তিগত মত। তবে ভাল মানুষ খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়েছি। সেই যে বুদ্ধদেবের কাছে কৃশা গৌতমী গিয়েছিল তার পুত্রের প্রাণ ফিরে পেতে। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, যে গৃহে কেউ মারা যায়নি এমন গৃহ থেকে একমুঠো সরষে নিয়ে আসলে তোমার পুত্রের প্রাণ ফিরে পাবে! কৃশা কোথাও এক মুঠো সরষে না পেয়ে ফিরে আসতেই বুদ্ধদেব বললেন, মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য। কৃশাও খুশী মনে ফিরে গেল। আমাদের দুর্ভাগ্য একটাও মানুষ পাইনি যে সম্পূর্ণভাবে নির্মল, নিষ্কলঙ্ক সর্বাংশে ভাল। সেজন্য নিজেকে ছোট মনে করার মত হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।

চিন্তামণি ও অনুপমা যাবার সময় তার বাড়িতে পরবর্তী রবিবারে দিবা ভোজনের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। যাবার সময় তাদের বললাম, পৃথিবীর চাকা আগের দিকে ঘুরছে, পেছনে ঠেলে দিতে কেউ পারবে না, তাই সব অবস্থাকে

মানিয়ে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

সন্ধ্যেবেলায় কোন কাজ ছিল না।

ছুটির দিনের আমেজ।

ঝুল বারান্দায় বসে দেখছিলাম বাইরের জগৎটাকে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বাড়ি আর বাড়ি কোনটা উঁচু আর কোনটা নীচু। কোনটা পাকা ইমারত কোনটা টালির খোলা বাড়ি। সুন্দর ও অসুন্দরের সহাবস্থান। বাড়ির চেহারার সঙ্গে মানুষের চেহারারও বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে এই শহরে। উঁচুতলার মানুষ আর নীচু তলার মানুষ কেমন একটা অলিখিত চুক্তিতে নিজেদের পাশাপাশি বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্ষোভ থাকলেও কোন সংঘর্ষ নেই।

না. তা নয়। আমারই বুঝবার ভুল। উঁচু তলার মানুষ অনুকম্পার দৃষ্টিতে বিচার করে নীচু তলার মানুষদের। আর নীচুতলার মানুষ অসহায়ের মত হাত পা ছোঁড়ে নিষ্ফল আক্রোশে।

আমার চিন্তায় বাধা পড়ল।

রাস্তার লোকজন ছোটাছুটি করছে।

বড় রাস্তায় নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হচ্ছে।

অনুমান বেঠিক নয়। পর পর কতকগুলো বোমার শব্দ জানিয়ে দিল অবস্থা মোটেই সুখদায়ক নয়। বড রাস্তার হাঙ্গামা গলিতে এসে ধাক্কা দেবে এটাই ছিল আশঙ্কা।

গেরস্ত বাড়ির দরজা ধমাধম বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা হয়ে গেল জনশূন্য। রাস্তার আলোগুলো টিম টিম করে জ্বলছিল। জনশূন্য রাস্তায় আলো আঁধারির খেলা। ঝুল বারান্দা থেকে উঠে এসে ঘরে বসলাম। সামনের প্রবেশ পথটি অর্গলবদ্ধ করে সবগুলো আলো নিভিয়ে দিলাম। শোবার ঘরের আলোটা জ্বলছিল, তাকেও আড়াল করে দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইলাম।

আমি তুরীয়ভাব ধারণ করার অবস্থায় পৌঁছে গেছি এমন সময় দরজায় ধাক্কা।

সিঁড়ির আলো জ্বেলে আইহোলে চোখ দিলাম।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম সুকুলকে দেখে।

এই হৈ-চৈ হাঙ্গামার মধ্যে সুকুল এভাবে আমার দরজায় এসে দাঁড়াবে ভাবতেও পারিনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সুকুলকে ভেতরে ডেকে নিলাম।

সুকুল তখন হাঁপাচ্ছিল।

ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বসতে বললাম।

প্রায় দশ মিনিট সুকুল কোন কথা বলতে পারল না। সে শুধু ক্লান্ত নয় ভীতও।

জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার সুকুল ?

ব্যাপার ! অনেক কিছু। নিজেদের ঝগড়া। মণ্টাকে দল থেকে তাড়িয়েছে পার্টি কিন্তু মণ্টা বলছে সে-ই খাঁটি আগমার্কা পার্টির লোক। তার অনুগামীর তো অভাব কোন কালে ছিল না, এখনও নেই। এদিকে সরকারী পার্টিতো ছাড়বার পাত্র নয়। তাদের অনুগামীর সংখ্যা অঢেল। এবার জমিদারী দখলের পালা। কে প্রভুত্ব করবে তার লড়াই চলছিল বাচনিক, এবার বচনে ওরা তৃপ্ত নয় দাদা তাই বচনের সঙ্গে আওয়াজ জুড়ে দিয়েছে। মরতে মরছি আমরা।

তা তোমার মরণ কেন ?

হাঙ্গামাটা আমার পাশের বস্তিতে। চালের টালিগুলো ঝপাঝপ ভেঙ্গে পড়ছে। আমি বাড়ি ফিরতে পারিনি। বউ ছেলেমেয়ের কি হল এখনও ভাবতে পারছি না। সাহস করে এগিয়ে ছিলাম হঠাৎ একটা বোমা এসে পড়ল কিছুটা দূরে। শোনা গেল গোঙ্গানি। তাকিয়ে দেখলাম আমাদের পাড়ার বিশে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখেই কেমন হাট প্যালপিটিশন বেড়ে গেল। কোন রকমে এখানে দৌড়ে আসতে পেরেছি। এক গ্লাস জল।

কাজের লোকটাকে বললাম, চিনি আর নুন দিয়ে এক গ্লাস সরবত করে দে।

সরবত খেয়ে সুকুল কিছুটা সুস্থ হল।

জিজ্ঞেস করলাম, পুলিশ পিকেট ছিল ওখানে তারা কি করছে ?

তারা পিকেট পয়েন্ট ছেড়ে গেরস্ত বাড়িতে ঢুকে মজা দেখছে। পুলিশের কথা আর বলবেন না দাদা। ওরা ঘটনা ঘটে গেলে রে-রে করে আসে। সামনে যাদের পায় তাদের টেনে ভ্যানে তোলে। হিসাবও করে না, কে দোষী কে নির্দোষ। পুলিশ সবাইকে চেনে, চিনেও অচেনার মত ব্যবহার করে।

বললাম উপায় নেই। পুলিশ আর পুলিশ নেই ভাই, ওদের ফুলিশ করে কার্য উদ্ধার করার রেওয়াজ প্রচলিত এই দেশে সেই স্বাধীনতা লাভের পরের দিন থেকে। এ বিষয়ে বাম ও দক্ষিণ কেউ কম নয়। ওরা বুঝেছে আমরা চাকরি করতে এসেছি। ভাল কাজ করে প্রভুর কোপে কেন পড়ব। যে কদিন চাকরি আছে সে কদিন প্রভু তোষণ করব, জনসাধারণের পকেট কাটব, মৌজমে রইবো। ইল গট্ টাকাটা মদ-মেয়েমানুষে ইল্ স্পেণ্ট করব। যারা তা করবে না, তারা জমার অঙ্ক বৃদ্ধি করবে। দরকার কি প্রভুদের বিরাগ ভাজন হওয়া।

সুকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এই স্বাধীনতা কি আমরা চেয়েছিলাম? হতাশার স্বরে সুকুল বলল।

এটা গবেষণার বিষয়।

আমি ভেবেছিলাম।

বললাম, আর ভাবতে হবে না। পুলিশও যেমন প্রভু তোষণ করছে, প্রভুরাও পুলিশ তোষণ করছে। প্রভুরা 'অন্যায়কারী পুলিশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও সাহস পায় না। ইসলামপুরে পুলিশ যেভাবে নিরীহ গ্রামবাসীদের গ্রাম ছাড়া করেছিল তার সমান দৃষ্টান্ত বিরল অথচ অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি হেলন করতে সাহস পেল না প্রভুরা।

সুকুল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ঠিক বলেছেন। কলকাতার পুলিশের কোন জাঁদরেল অফিসারকে বডিগার্ড লাইনে নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা যেভাবে অপদস্থ করেছিল তারও তুলনা নেই। অবশ্য এর বিনিময়ে পুরস্কার অথবা তিরস্কার কার প্রাপ্য জানি না। তবে অবমানিত অফিসার কিছুকাল পরেই প্রমোশন পেলেন, ওরা বলে সিনিয়ারিটিতে ওই পদ ওঁরই প্রাপ্য। এতেই বোধহয় মনের ক্ষত নিরাময় হয়েছে।

অথচ এই অফিসারের রাজত্বকালে যেসব অঘটন ঘটিয়েছে পুলিশ তারও হিসাব আজও হয়নি। স্টেটবাস ডিপোতে হাঙ্গামা, মুরারীপুকুরে গুলি চালনা, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইনসটিউটের সামনে পুলিশী অনাচার—এসব অনেক ঘটনাই কিন্তু অযোগ্যতা প্রমাণ করে প্রশাসন চালাবার মত। অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা।

সুকুল বলল, তবে পুলিশকে খুশী রাখতে বর্তমান সরকার নানাভাবে তাদের

তোষণ করছে। লোক নিন্দা ও আন্দোলনকে তুচ্ছ করে পুলিশীরাজকে যেমন সমর্থন করছে, তেমনি পুলিশকে তোষণ করে চলছে বর্তমান সরকার। কারণ প্রভুরা জানে পুলিশই তাদের একমাত্র সহায় তাদের রাজা কায়েম রাখতে। বহু খুনী অনাচারী পুলিশ অফিসারকে সাদরে কোলে টেনে নিতেও এরা দ্বিধা করছে না।

বললাম, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। এই বাংলার পুলিশ নিয়ে মাথা ঘামানো অনর্থক। বিহার-উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর পুলিশের অসীম মহিমা। আরোয়ালে দ্বিতীয় জালিওয়ানাবাগ সৃষ্টি করেও বিহার পুলিশ বুক ফুলিয়ে চলছে কারণ বিন্ধেশ্বরী দুবের চাকরি রক্ষা করতে পুলিশের সহায়তা অপরিহার্য। বীর বাহাদুরের বীর পুলিশরা মীরাটের উপকণ্ঠে যেভাবে নরহত্যা করেছে তা স্মরণীয় কালে কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। দিল্লী পুলিশের অপার মহিমা। ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার পর বিনা বাধায় তিন হাজারের উপর শিখকে পুলিশের সামনে হত্যা করল সমাজবিরোধীরা অথচ পুলিশ তা রোধ করতে একটা গুলিও খরচ করল না। আশ্চর্য ঘটনা এইভাবেই ঘটে।

উড়িষ্যার ঘটনাটা বাদ দিচ্ছেন কেন দাদা। ছাত্রদের যেভাবে পুলিশ হত্যা করেছিল কিছুকাল আগে তাতে মনুষ্যত্ববোধ ডুকরে উঠলেও জানকীবল্লভের মনে সামান্য আঁচড়ও কাটেনি। কি কংগ্রেস, কি বামপন্থী সবাই চায় পুলিশকে হাতে রেখে তাদের গদী কায়েম রাখতে। তাই পুলিশ থেকেও নেই। আইন হল, পুলিশ হবে আইনের দাস। কার্যকালে দেখা যায় আইন হল পুলিশের দাস।

বললাম, ভাল লোক কি নেই পুলিশে? আছে কিন্তু তারা কাজ করার সুযোগ পায় কম, করলেও তারা পুরস্কৃত হবার চেয়ে তিরস্কৃত হয় বেশি। এর ফলে কাজ করার স্পৃহা নষ্ট যেমন হয় তেমনি তাদের নৈতিক শক্তিও নষ্ট হয়।

আপনি যা বলছেন তা সত্য কিন্তু মানুষ আন্তরিকভাবে পুলিশকে কেন ঘৃণা করে তা বলতে পারেন কি?

কারণ নিরীহ লোকদের ওপর অযথা জুলুমবাজি। এই তো সেদিনের কথা। দুজন সমাজ বিরোধী বোমা পিস্তল নিয়ে লড়াই করল, মরল দুজন আর বোমার splinter-এ আহত হল পথচারী নিরীহ কয়েকজন। পুলিশ এল দুঘণ্টা পর। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হল। হাসপাতালের দালালরা আহত

একজনকে বলল, অপারেশন করতে হবে।

রোগীর আত্মীয় স্বজনরা অবশ্যই সম্মতি দিল। কিন্তু অপারেশনের জন্য দাবী করল নগদ এক হাজার টাকা। এক হাজার! চমকে উঠল সবাই। হাসপাতালে অপারেশন হবে তার জন্য দিতে হবে এক হাজার টাকা দক্ষিণা। এতেই শেষ নয় দাদা।

এর পরও আছে?

সেটাই তো মজার ব্যাপার। পুলিশ এসে জেরা আরম্ভ করল। মৃত্যুর সম্মুখীন রোগীকে এমন ভাবে জেরা করল যার গলিতার্থ হল এই রুগীও সমাজ বিরোধীদের একজন। ছাপোষা কেরানী পথ চলতে সমাজ বিরোধীদের বোমায় আহত হয়েছে তাকেই আসামী স্থির করে পুলিশ বয়ান তৈরী করতে বসল।

তারপর?

অভিভাবকরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসল।

পুলিশ অফিসার পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে রোগীর বিধবা মাকে বলল, পাঁচ হাজার টাকা না দিলে আপনার ছেলেকে আসামী করে চালান দেব।

তারপর?

বাকিটুকু অনুমান করে নিতে পারেন। বলা বাহুল্য এতগুলো খুন জখম হলেও একজন সমাজবিরোধীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। না, না, করতে পারেনি বলা ভুল। পুলিশ জানে, কে বা কারা অপরাধী কিন্তু সেখানেও তাদের ঠেক্ আছে। এইভাবে জুলুমবাজি হয় বলেই পুলিশকে ঘৃণা করে জনসাধারণ এবং তাদের সহযোগিতা করতে ভয় পায়। আরেকটা ঘটনা আরও মজাদার। একটা সোনারূপার দোকানে ঢুকে মালিকের ছেলেকে গোয়েন্দা প্রবররা গ্রেপ্তার করল। ছেলেটি সবে কৈশোর পেরিয়ে বাবার সঙ্গে দোকানে বের হচ্ছে শিক্ষানবিশী করতে। অপরাধ? বিদেশী চোরাই ভি-ডি-ও ক্রয়। কিন্তু ভি-ডি-ও তো দূরের একটা 'ভি' তার কাছ থেকে পায়নি।

এতো হামেশাই হয়।

এতে কিছু নতুনত্ব আছে। এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই অথচ তিনদিন তাকে হাজতে বাস করতে হল। পুলিশ লিখল, পেটি কেস, কিন্তু

তার দায় মেটাতে তিনশতটি কাগজী মুদ্রা প্রণামী দিতে হল ব্রাহ্মণ ইনসপেক্টারকে। আমাদের দেশের আইন বিচিত্র। আদালতে প্রমাণ না হলে কাউকে অপরাধী বলা যায় না। কিন্তু এইসব অন্যায় কার্য আদালতে প্রমাণ করা অসম্ভব। একটা বিরাট দেশের প্রশাসন চলছে কয়েকজন চোর, ছিনতাইকারী, খুনে পুলিশ অফিসারের দয়াতে অথচ প্রভুরা নির্বিকার! আজ যে বোমাবাজি চলছে তার পেছনে কারা আছে তা ভাল করে জানে পুলিশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই হয়ত গ্রেপ্তার করা হবে না। যদি শাসকদলের লোক গ্রেপ্তার হয়, তা হলে মামলা এমনভাবে সাজানো হবে যাতে প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস পায়।

বললাম, বিচিত্র এই দেশের বিচিত্র প্রশাসন।

তবে দাদা ভারতে চলছে সেই ক্লাইভ আমলের ডবল গভর্ণমেণ্ট। টাকার মালিক কেন্দ্র আর লাঠি পেটাবার মালিক রাজ্য। ইংরেজ হয়েছিল টাকার মালিক আর লাঠি পেটাবার মালিক হয়েছিল নবাব। একই অবস্থা। এরপর প্রশাসন ভেঙ্গে পড়লে তার জন্য কে দায়ী হবে? ইংরেজ তথা কেন্দ্র অথবা নবাব তথা রাজ্য সরকার?

এই অবস্থা দেখা দিয়েছিল চীনে। তারপর যা হয়েছে তাতো ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির জন্য আমরা প্রস্তুত। আজ আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই সুকুল। আজ তুমি আমার অতিথি। রাতটা কাটিয়ে যাও এখানে।

সুকুল চিন্তিতভাবে বলল, তাতে আমার আপত্তি না থাকাই উচিত। কিন্তু ভাবছি ঘরের কথা।

ওরা ভালই আছে। না থাকলে তোমার কি করার আছে।

অনুভব করা, সমবেদনা জানানো আর ভাল করে তোলার দায়িত্ব। সংসার তো করলেননা দাদা। সংসার করলে বুঝতেন। মনে হচ্ছে হাঙ্গামা মিটেছে। এবার উঠি।

তোমার ইচ্ছা। তবে তোমাকে একা যেতে দেব না। আমিও সঙ্গে যাব।

আপনি যাবেন! তা হয় না দাদা।

বললাম, হতেই হবে। তোমাকে একা যেতে দিতে মন চায় না। পৃথিবীটা গোলাকার তাই গোলমালটা সব সময়। তাই পাকা চুলের মাথা নিয়ে

তোমার সঙ্গে যাব। আর কিছু হোক আর না হোক বয়সটাকে ওরা রেয়াত করবে।

ভরসা নেই দাদা? ওদের কাছে সবাই সমান।

সুকুলের সঙ্গে বের হলাম।

কলকাতার মত শহরে গায়ে ধাক্কা না দিয়ে লোক পথ চলতে পারে না। সেই ব্যস্ত শহরের রাস্তায় একটি লোকের ছায়াও দেখতে পেলাম না। জনমানবহীন পথ। রাস্তার ধারের গেরস্ত বাড়ির জানালাগুলো বন্ধ. উঁচু উঁচু বাড়ির আলসেয় দাঁড়িয়ে বোধহয় মেয়েরা উঁকি দিয়ে দেখছে রাস্তার অবস্থা। তাদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না! বোধহয় ওদের অনুপস্থিত স্বজনদের জন্য উদগ্রীব হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে।

পাশাপাশি দুজন চলছি। রাস্তার লোক নেই। টিমটিম করে জ্বলছে রাস্তার আলো।

কয়েকটি পুলিশের জিপ টহল দিচ্ছে।

একটা জিপ এসে দাঁড়াল পাশে। আমাদের ভাল করে তাকিয়ে জিপটা বেরিয়ে গেল। আমরাও চলতে থাকি, যেন কিছুই হয়নি কোথাও এমন একটা ভাব নিয়ে চলতে থাকি।

॥ সাত ॥

অনেকদিন পর নির্ঝরশীতল সমাদ্দার এসেছেন। সঙ্গী সাবলীলা রায় সমাদ্দার নন। আজ যিনি তাঁর সঙ্গী তিনি বয়স্ক, বৃদ্ধ বললেও চলে, আমার খুব পরিচিত নন, আবার একেবারে অপরিচিত নন। নির্ঝরশীতল বলল, আমার স্ত্রীর সম্পর্কে পিসেমশায়।

বললাম, বসুন সুনীলবাবু।

নির্ঝরশীতল অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে পিসেমশায়ের পূর্ব পরিচয় আছে দেখছি।

আছে। তবে খুব ঘনিষ্ঠ নয়। এক সময় আমরা ঢাকা জেলে ছিলাম ইংরেজ সরকারের অতিথিরূপে। তবে এক ওয়ার্ডে থাকিনি। কখনও কখনও দেখা হয়েছে, কুশল জিজ্ঞাসা করেছি উভয়ে উভয়কেই। এই পর্যন্ত!

সুনীলবাবু হাসলেন।

আপনার শুভাগমনের কারণ জানতে পারি কি?

অবশ্যই। তবে প্রতিকার কামনায় আসিনি। এসেছি নিজেকে যাচাই করতে, অর্থাৎ যার সম্পর্কে বলব তিনি আপনারও পরিচিত। আমার ব্যবহারটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটাই যাচাই করতে এসেছি আর প্রকাশ করতে চাইছি মনোবেদনা।

আমি হেসে বললাম, স্থান ঠিক নিরূপণ করেছেন কি? আপনার কথা শোনার পর মতামত দেবার আমার কতটা যোগ্যতা আছে সেটাও তো ভাবতে হবে। তবুও বলুন।

সুনীলবাবু বললেন:

আমার খুড়তুতো দাদার ছেলে অনিমেষ। তাকে দেখেন নি। দেখবার মত সুযোগ কখনও ঘটেনি।

অনিমেষ এসে বলল, কাকা, আমার সবনাশ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ শুনেই চমকে উঠলাম।

আমাকে হঠাৎ বদলি করেছে।

বললাম, সরকারী চাকরি হল বদলির চাকরি। সরকার যে কোন সময় বদলি করতে পারে। এতে সর্বনাশ কেন হবে?

সরকার বদলি করতে পারে ঠিকই কিন্তু তিন বছরের আগে কাউকেই বছরের মাঝখানে বদলি করার রেওয়াজ নেই। এটাই অলিখিত আইন। আমার তো ষোলমাস পুরো হয়নি। তাও মেনে নিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু বছরের মাঝখানে এইভাবে বদলি করাতে ছেলেমেয়েদের পড়ার কতটা ক্ষতি হবে তাতো বুঝতেই পারছেন। ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়াও যেমন বিপদ এখানে রেখে গেলেও সমান বিপদ। কে দেখাশোনা করবে বলুন।

অনিমেষের অসুবিধাটা বুঝলাম।

আরও আছে কাকা। আমার অবসর গ্রহণের সময় হয়েছে। আর সাত আট মাস পরে আমাকে অবসর নিতে হবে। এমন সময় এই বদলি গুরুতর অবিচার মনে করছি।

বললাম, আমি কি করতে পারি?

আপনার অনেক বন্ধু সহকর্মী তো আছে প্রশাসনে, তাদের বলে কয়ে

কোন রকমে কটা মাস বদলি রদ করতে না পারলে আমার সমূহ বিপদ।

তাতো বুঝলাম কিন্তু ওরা কি আমাদের মত লোকের কথা শুনবে! তবুও চেষ্টা করব। সুফল এমন কিছু হবে বলে মনে করছি না। এক সময় যারা ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে ফটর ফটর করে আমার কাছে এসেছে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে, অনেক দিন মুখ শুকিয়ে এসে বলেছে, দাদার ঘরে খাবার কিছু আছে? এদের কেউ কেউ এখন মন্ত্রী-ফন্ত্রী হয়েছে, তাই ভয় হচ্ছে আমাকে বিমুখ হতেই হবে।

অবশেষে গেলাম একজন মাতব্বরের কাছে। এই মাতব্বর যখন বিধায়ক হবার রিহার্সেল দিচ্ছিলেন তখন মাঝে মাঝেই আসতেন আমার বাড়িতে। ভেবেছিলাম উনি হয়ত কোন উপকার করতে পারবেন।

উপকার করেছিলেন একখানা চিঠি লিখে!

তাঁর চিঠি নিয়ে গেলাম একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর কাছে।

মন্ত্রী বললেন, আমি কথা বলে দেখছি। কাল আসবেন।

মন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখা হল প্রাক্তন ফটর্ ফটর্ ছেঁড়া চটির মালিকের সঙ্গে। আজকাল উনি মন্ত্রী হয়েছেন। বেশ জমজমাটি লোক, স্তাবকও প্রচুর। করিডরেই দেখা।

মন্ত্রী বললেন, কি খবর সুনীলবাবু?

বললাম, অনেক কথা। তাতো আপনাকে এই করিডরে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

আসুন আমার চেম্বারে।

চেম্বারে গিয়ে বললাম সব ঘটনা। শুনে বললেন, কাল আসবেন। দেখি কি করা যায়।

আশান্বিত হয়ে ফিরে এলাম।

পরের দিন যথাসময়ে হাজির হলাম মহাকরণে। ভাবলাম প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেই যাই। উনি যদি কিছু করেন অথবা করতে পারেন। বসেছিলাম প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘরের পাশেই বসবার জায়গায়। এমন সময় আমাদের সেই ফটর্-ফটর্ মন্ত্রী ঢুকলেন প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘরে। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঢুকলেন চেম্বারে।

পরবর্তী ঘটনা আরও চমৎকার!

প্রভাবশালী মন্ত্রী বললেন, কাল আসবেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা এখনও হয় নি।

গেলাম ফটর্-ফটর্ মন্ত্রীর ঘরে। প্রবেশ করা মাত্র মন্ত্রী বললেন, আপনি তো সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। সেখানেই যান, আমায় কিছু করার নেই।

বললাম, আপনাদের মাতব্বরই তো তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আপনি তো ছিলেন না, তাই কাজটা জরুরী মনে করে গিয়েছিলাম তাঁর মতামত শুনতে।

সেটাই শুনে নিন। আপনি চলে যান। আপনার জন্য কিছুই করতে পারব না। আপনি যান। আপনার কোন কথাই শুনতে চাই না।

এতক্ষণ সুনীলবাবুর কথা শুনছিলাম। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নির্ঝরশীতল সমাদ্দারের কণ্ঠস্বর আমার সম্বিত ফিরে দিল।

কি ভাবছেন দাদা।

ভাবছি গণতন্ত্রের যুগে ফটর্-ফটর্ লোকও মন্ত্রী হতে পারে কিন্তু পুরাতন পরিচয়টা এভাবে অস্বীকার করতে পারে তা চিন্তাও করা যায় না। তার চেয়ে বড় কথা সুনীলবাবুকে সোজা কথা ঘর থেকে বের করে দিলেন অথচ লজ্জিত হলেন না। সামান্য ভব্যতাটুকুই বা কি করে ভুলে গেলেন!

সুনীলবাবু বললেন, সেটাই ভাবছি দাদা। কিন্তু পৃথিবীটা গোল তাই গোলাকার পৃথিবীর ঘূর্ণনে ওঁকে তো কোন সময় পথে এসে দাঁড়াতে হতে পারে। রাজনীতি এমন একটি বিষয় যাতে রাজনীতির খেলোয়াড়দের জন্য কখনও ফুলের মালা থাকে কখনও জুতোর মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে থাকে জন সাধারণ। এই সহজ সত্যটা ভুলে যায় ক্ষমতার গর্বে। এ ক্ষমতা কতটা ঠুনকো তা যদি জানা থাকত তা হলে মন্ত্রী হিসেবে ভদ্র হতে না পারলেও মানুষ হিসাবে ভদ্র হবার চেষ্টা করা উচিত হত। অবশ্য আমার অভিযান সফল হয়নি। যে কাজের তদ্বিরে গিয়েছিলাম তা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু কষ্ট হয়েছিল প্রার্থীর।

বললাম, আপনি তো অভিজ্ঞ লোক। রাজনীতির ব্যাপারী না হলেও আপনি রাজনীতি বোঝেন। আমাদের দেশে বহুকাল চরম দক্ষিণপন্থীদের দাক্ষিণ্যে আমরা হাড় জির জিরে হয়ে গেছি। এবার বামপন্থীরা 'বাম' হয়েছে

আমাদের কঙ্কাল নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে। এর পরিণাম সম্বন্ধে আমরা সবাই সমান ওয়াকিবহাল।

নির্ঝরশীতল পোষ্ট ইনডিপেনডেন্স প্রোডাক্ট্। জন্ম তার পঞ্চাশের দশকের প্রথম অংশে। ভারতের স্বাধীনতা কি ভাবে এসেছে তার হিসাব পাঠ করেছে ইতিহাসের পাতায়। এই ইতিহাসও লেখা হয়েছে শাসকের স্বার্থে ও নির্দেশে। অতীতে যেমন রাজরাজড়ার দরবারের ওয়াকিনবীশরা রাজার ইচ্ছা অনুসারে গুণাবলী লিখে গেছে, বর্তমানেও একই কায়দায় ইতিহাস রচনা হয়েছে। সেই ইতিহাস পড়া নির্ঝরশীতল বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই ঘটনাটা শুনে বলল, ডেনজার র‍্যাহেড।

হেসে বললাম, অতি দরিদ্র এক ভদ্রমহোদয়ের ছয় সাতটি সন্তান তাঁদের খোরাক জোটাতে বারমাস নাজেহাল। সামান্য বেতনের কর্মচারী তাও বিশেষ মর্যাদার নয়। উপরি উপার্জনের পথ হোমিওপ্যাথি। লোকে বলে এর নেই কোন গতি সে করে হোমিওপ্যাথি। এতে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হয়। তারই একটি পুত্র হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করল। পাঠ্য জীবনের মোটামুটি খরচ জোটাতে ভীড়ে পড়ল রাজনৈতিক দলে। রুটিরুজি জুটল, পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাল। তারপর রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত মহাকরণের চেম্বারে স্থান পেল দলের মহানুভবতায়। অবশ্য প্রথম জীবনে নেতাদের ছাতা-গামছা বহন না করলে অত তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে হয়ত পারত না। সবই বদলেছে বদলায়নি মনটা। সেখানে দম্ভ বাসা বেঁধেছে, যদি কেউ জেনে ফেলে তার অতীত তাই বর্তমানকে দম্ভের সাজসজ্জায় ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

কার কথা বলছেন দাদা?

সেটা জানার দরকার নেই। তবে ভারসাম্য হারিয়ে পরিবারগতভাবেও বেশ অপযশ অর্জন করার পরও তার কাছ থেকে অন্য কেউ সৎ ব্যবহার পাবার যোগ্য যে নয় তা জেনেও অনেকে তার কাছে গিয়ে অপদস্থ হয়েছে এমন ঘটনাও আমরা জানি।

কিন্তু? এর শেষ কোথায়?

বললাম, ওটা তো সুনীলবাবু বলেই দিয়েছেন। রাজনীতি রাজা করে রাজনীতি ভিখারী করে, এর লক্ষ লক্ষ উদাহরণ এই হতভাগা দেশেই আছে।

মোগলদের বাদশাহ বাবরের বংশে সাক্ষাৎ বংশধরের সংখ্যা ছিল বাইশ শতের উপরে। আজ তারা কোথায়? যাক্ ওসব কথা। বলুন সুনীলবাবু আমার কি কিছু করার আছে?

আপনি করবেন না। করবে আপনার কলম।

ভেবেছিলাম, কলম ধরব কিন্তু এই সব নাচাশয়দের বিরুদ্ধে কলম ধরলে কলমেরই অবমাননা ঘটবে। নিজেকে ছোট করার ইচ্ছা ছিল না। সুনীলবাবু অপমান হজম করে ঘরে ফিরে গেছেন। দেশপ্রেমের উপহার পাঁচশত টাকা সম্মানী পেয়ে নিশ্চয়ই খোসমেজাজে আছেন। তবে বুমেরাং শব্দটা যেন কেউ ভুলে না যায়। এটাই আমার শেষ কথা।

ইন্দিরা গান্ধী আতঙ্কিত। দলে ভাঙ্গন, বাইরে জনতার রোষ। এসব সামাল দিতে না পারায় রাজপুত্র সঞ্জয় গান্ধী ব্যস্ততার সঙ্গে পরামর্শে বসল। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদরা ভেবে চিন্তে বলল, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হোক্। তা হলে গদী রক্ষাও হবে আর অশান্ত জনমতকে দমন করাও সম্ভব হবে।

এই সব উপদেষ্টারা ছিল নিম্নশ্রেণীর স্তাবক। জনসাধারণের সঙ্গে এদের সংযোগ কম। জনমতকে অগ্রাহ্য করে জরুরী অবস্থা জারী করা হল।

জরুরীর সঙ্গে জরুরৎ হল বিরোধীদের জেলখানায় পাঠানো। এই কাযটি সুচারু রূপে পালন করল রাজ্য সরকাররা। উপরি হিসাবে বেছে বেছে কিছু লোককে হত্যাও করা হল নানা অজুহাতে। নিহতদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম বাংলার সরকার বিরোধীরা। অন্যান্য রাজ্যে বন্দীর সংখ্যা অসংখ্য হলেও নিহতের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের নিহত ও বন্দীদের অধিকাংশই ছিল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টপার্টির কর্মী ও নকসাল আন্দোলনকারীরা, উত্তর ভারতে বন্দীদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা, সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মীরা, লোকদলের কর্মীরা, বিরুদ্ধ কংগ্রেস দলের কর্মীরা। এদের সম্প্রদান করল বহু নেতা। অর্থাৎ বিরোধীরা নির্মূল হল।

ইন্দুর বিন্দু খসে পড়ল জেলখানায়।

জেলখানায় বসে উত্তর ভারতের নেতারা পত্তন করল জনতা পার্টি। জেলখানা থেকে বের হয়েই জন্ম নিল জনতা দলের। সমবেত ভাবে সব

দল লড়াই করল ইন্দিরার বিরুদ্ধে। নির্বাচনে পরাজয় ঘটল কংগ্রেসের। কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেসের হাতছাড়া হল। সরকার গঠন করল নব গঠিত জনতা পার্টি।

জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন চৌধুরী চরণ সিং।

চরণ সিং গ্রেপ্তার করলেন ইন্দিরা গান্ধীকে।

অভিযোগ প্রমাণিত করার কোন সূত্র না পেয়ে আদালত ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তি দিলেন।

সরকারী আদেশে প্রত্যেক রাজ্যে বসল তদন্ত কমিশন। জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা সরকার কি ভাবে নির্যাতন করেছে তা স্থির করা এবং কোন কোন সরকারী কর্মচারী এত অত্যাচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তা স্থির করা এই তদন্ত কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ঢাক ঢোল পিটিয়ে তদন্ত কমিশন বসল। গাদা গাদা নথি পত্র এবং অসংখ্য সাক্ষী হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করল।

ভারতীয় জীবনের অভিশাপ গৃহবিবাদ আর বিশ্বাসঘাতকতা। এরই চরম রূপ দেখা গেল অচিরেই।

মোরারজি দেশাই প্রধান মন্ত্রী। হিন্দী এলাকা ছিল প্রধানমন্ত্রী পদের কায়েমী দাবীদার. মোরারজি গুজরাটি। তাই হিন্দী বলয়ে আরম্ভ হল চক্রান্ত। কি করে মোরারজিকে হটিয়ে চরণ সিং-কে প্রধানমন্ত্রী করা যায় সেই খেলায় মেতে উঠল সংসদের সদস্যরা। এদের নেতৃত্ব দিল রাজনারায়ণ। ভারতীয় রাজনীতিতে রাজনারায়ণ হল 'আয়ারাম গয়ারাম'-দের উৎকৃষ্ট তথা অপকৃষ্ট নিদর্শন। অন্তর্দ্বন্দ্বে জনতা সরকার ভেঙ্গে গেল। সুযোগ সন্ধানী ইন্দিরা মাথামোটা জাঠনেতা চরণসিংকে প্রলোভিত করল প্রধানমন্ত্রী হবার। চরণ সিং তার লোকদল সদস্য নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। লোকদলকে বাদ দিয়ে মোরারজির মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেল। মোরারজি পদত্যাগ করলেন।

ইন্দিরা চরণ সিং-কে বললেন, তুমি প্রধানমন্ত্রী হও, আমার কংগ্রেস সদস্যরা তোমাকে সমর্থন করবে তবে সরকারে যোগ দেবে না।

ইন্দিরার ফাঁদে চরণ সিং পা দিলেন।

সময় এল সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণের।

চরণ সিং কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ার আশায় গদীতে বসেছিলেন কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণের সময় ইন্দিরা সরে দাঁড়ালেন। চরণ সিং মন্ত্রী সভার পতন ঘটল, আবার নির্বাচনের মুখোমুখী হতে হল। চরণ সিং জনতা পার্টিতে যোগ দিতে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেসব চরণ সিং বেবাক ভুলে গিয়ে দলের প্রতি বেইমানী করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসতে। একইভাবে ইন্দিরা কংগ্রেস সমভাবেই বেইমানী করেছিলেন চরণ সিং-কে গদী থেকে হটাতে।

এবার নির্বাচনে আবার কংগ্রেস ফিরে এল ক্ষমতায়।

পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার বিপদে পড়ল। সর্বদা শঙ্কা। এই গেল, এই গেল গদী।

তদন্ত কমিশনকে ততক্ষণে খাটিয়াতে তুলে মহা নির্বাণের পথে পাঠানো হয়েছে কিন্তু জনসাধারণ অনেক কিছু জেনে গেছে জরুরী অবস্থার মহিমা। এই মহিমা বিতরণকারীদের চিনতে বাকি থাকে নি কারও। তবে চিনতে বাকি ছিল বামপন্থী সরকারকে।

অনেক ঘটা করে বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতাদের ও কর্মীদের ওপর যারা অত্যাচার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার কেমন পঙ্গুত্ব লাভ করল। বলা যায়, এই সব অত্যাচারী অনাচারী পুলিশ কর্মচারীদের জামাই আদরে অনুগৃহীত করা হল, তাদের আরও পদোন্নতি ঘটানো হল। পিঠের চামড়ায় বেতের দাগ তখন মিলিয়ে এসেছে।

ইন্দিরা দাওয়াইতে পিঠের জ্বালা ভুলে ভাল ছেলের মত হঠাৎ কেন বা ভেজা বেড়ালের মত মিউ-মিউ করে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের বংশবদ হয়ে গেল, অবশ্য গদী রাখতে হলে পিঠের চামড়া শক্ত রাখার মহামন্ত্র শেখা আবশ্যিক। তদন্ত কমিশনের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল, আর তদন্তের রিপোর্ট মহাকরণের কোন ডাষ্টবিনে আজও শোভা পাচ্ছে কে বলতে পারে।

অথচ এক সময় যুক্তফ্রন্টের উপমুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্যাডারদের বলেছিলেন অত্যাচারী পুলিশ ও আমলাদের নাম লিখে রাখতে। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আবার আমরা ক্ষমতায় ফিরে আসব। তোমাদের ওপর যারা জুলুম অত্যাচার করছে তাদের নাম লিখে রাখ। আমরা ক্ষমতায় ফিরে এসে ওদের শায়েস্তা করব।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ক্যাডারদের মধ্যে। প্রায় চল্লিশ হাজার পুলিশের প্রায়

দুই তৃতীয়াংশের নাম লেখা কাগজ ঠেলা বোঝাই দিয়ে আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে জমা দিয়ে আজও ক্যাডাররা ভাবছে, তাইতো ওদের তিরস্কারের বদলে পুরস্কার কেন মিলছে ?

বিরাট এই দেশের এই বিচিত্র ব্যবস্থা দেখে নাক ঝাড়া দিয়ে সবাই চুপ করে গেছে।

ঘটনাটা পুরানো, নতুন করে শোনাল নির্ঝরশীতল সমাদ্দার। বলল, এ কেমন গণতন্ত্র ঠিক বুঝতে পারছি না দাদা।

বললাম, ওদের যুক্তি কিন্তু অভ্রান্ত। যার, সরকারী কর্মচারী যথা আমলা, পুলিশ, —ওরা বলে আমরা আমাদের চাকরির নীতি মেনে চলি। We are loyal to our service—আমাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। গৃহে আমরা গৃহিণীর দাস, দপ্তরে আমরা প্রশাসকের দাস। প্রশাসক বদল হলে নীতি বদলায় আমরাও কর্ম পদ্ধতি বদল করি।

নির্ঝরশীতল বলল, ঠিকই বলেছেন দাদা, রাজ্যপাল ধর্মবীর যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিলেন। পরের দিনে মন্ত্রীরা জনসভা ডাকলেন ময়দানে। সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করল। গতকাল যারা ছিল মন্ত্রী তারা পরদিন ময়দানে হাজির হতেই পুলিশের লাঠিতে তারাই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওরা সত্যিই loyal to service. আইনের দাস।

সুকুল পাশে বসে ছিল। উত্তেজিত ভাবে বলল, কচু। প্রশাসক যেমন আইনকে কদলী প্রদর্শন করে, তেমনি আইনকে কদলী প্রদর্শন করে প্রশাসনের স্তাবকরা। আইনটা বর্তমানে কাগুজে ব্যাপার। প্রশাসকের ইচ্ছাটাই হল আইন। সেই অলিখিত আইন মেনে চলে আমলা চৌকিদার সবাই। এখানে মন্ত্রী থেকে চৌকিদার অবধি সবাই গঙ্গাজল ধোয়া তুলসীপাতা। আর জনসাধারণ হল ভোটের দালালদের অনুগত জন। তাদের ব্যথা বেদনা বুঝবার মত মানসিকতা প্রশাসকদের নেই।

নির্ঝরশীলও বলল, অবশ্যই। তবে দূষিত গঙ্গাজল ধৌত তুলসীপত্র আরও দূষিত হয়েছে দাদা। দোষ তুলসীপাতার নয়, দোষ গঙ্গাজলের। যাকে আপনারা বলছেন প্রশাসক অর্থাৎ যে দল প্রশাসন পরিচালনা করে তাদের দোষ।

আমি শ্রোতা মাত্র।

আমাকে বাক্‌হীন দেখে সুকুল বলল, দাদা যে চুপ।

ভাবছি। তুমি সুকুল। অর্থাৎ তোমার কুল হল সু অর্থাৎ উত্তম। তোমার কুল উত্তম কুল, কিন্তু এই আবর্জনায় তুমি কেন জড়িয়ে কুল হারাবে।

সুকুল হেসে বলল, কুল অনেক দিন হারিয়েছি দাদা। বামুনের ছেলে যজমানী করে দিন না কাটিয়ে আপনার মত দাদাদের পাল্লায় পড়ে কিছুটা রাজনীতির পাঠ নিতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। আমার অবস্থা না ঘরকা না ঘাটকা। কুল হারিয়ে অকূলে ভাসছি। একটা সুখবর তো শুনেছেন?

কত সুখবর শুনলাম, কিন্তু তোমারটা শুনেছি কিনা জানি না।

আমাদের বামপন্থী সরকার ঠিক করেছে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানে, কেন্দ্র যখন আগ্রহী নয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা নেই পুঁজি নিয়োগ করার তখন প্রগতিশীল পুঁজিপতিদের ডেকে পাঠিয়েছে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে।

মার্কস সাহেব বলেছেন পুঁজিপতিদেরও বিভিন্ন শ্রেণী আছে!

যেমন পেটি পুঁজিপতি, পাকা পুঁজিপতি, প্রগতিশীল পুঁজিপতি, বামপন্থী পুঁজিপতি। যাকে তোমরা বলে থাক লিবারেল বুর্জোয়া।

রাইট্। আমাদের বামপন্থীরা মার্কসবাদী। তাই মার্কসকে বাদ দিয়ে যে বামপন্থী পুঁজিপতিরা দেশের নানা অংশে হাঁপানীর রুগীর মতো হাপর টানছে তাদের কোলে টেনে নিয়ে দেশ ও সমাজকে কর্মচঞ্চল করে শোষণহীন পুঁজির উপাসনা করছে। চমৎকার!

সুকুল বলল, দাদা, লেনিন ছিলেন মহামূর্খ। তাঁর তত্ত্ব হল রাষ্ট্র সকল সম্পদের মালিক কিন্তু লেনিন জানতেন না সম্পদ উত্তর পুরুষে বণ্টনযোগ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় বিভাজ্য তবে তাকে সুগার কোটেড করার জন্য বামপন্থার ছাপ অবশ্য প্রদেয়।

বাজে বকনা সুকুল। অর্থনীতিবিদরা এটা সমর্থন করছে।

উপায় কি বলুন দাদা। সবাই তো পুলিশ ও তার দোসর ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। মার্কসবিরোধী কোন কাজ করলেই যদি সমালোচনা হয় তা হলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মহিমা আর থাকে না। তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার ও প্রসার করতে পুলিশ ও ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী নিয়োগ না করে উপায় আছে কি। তবে কথায় আছে, দাদা মরদ বৌদির কাছে। আমাদের এই বাম-

মার্গী দাদারা নিরীহ জনসাধারণকে মনে করে তাদের ঘরের অসহায় বউ। যখনই কোন আবদার অথবা আন্দোলন আরম্ভ হয় তখনই দাদারা মরদ সেজে ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী পাঠায় শায়েস্তা করতে।

কিন্তু দাদা ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীকে একেবারে বেওকুফ করেছে দার্জিলিং-এ। সেখানে মোটেই সুবিধা করতে না পেরে ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে শিলিগুড়িতে। অসহায় মানুষকে পিটিয়ে ন্যায্য দাবীকে নস্যাৎ কর যত সহজ, তত সহজ নয় সশস্ত্র লোকের মোকাবিলা করা। যারা এতকাল দাদা সেজে বউদি ঠেঙ্গিয়েছে তারাই বউদি সেজে পালিয়ে বাঁচছে। গোর্খাল্যাণ্ডের দাবী খুবই অসাংবিধানিক ও অসঙ্গত হোক তাতে কেউ সমর্থন জানাক অথবা না জানাক, কতিপয় বিভ্রান্ত ভারতে বসবাসকারী অভারতীয় নেপালীর হাতিয়ারের সামনে ঠ্যাঙ্গড়ে বাহিনী একেবারে কুপোকাৎ।

তাই তো ভাবছি দাদা। সেখানে কি হচ্ছে তা ভাল করে বুঝবার আগেই কোটি কোটি টাকার সম্পদ নাশ ঘটে গেল। বাধ্য হয়ে বিনা বিচারে আটক আইন জারী করতে হয়েছে! বড় বড় নেতারা বলছেন, এই আইন জারী বামপন্থীদের নীতি সম্মত নয়, কিন্তু তা জারী করা হয়েছে নেহাৎ নিরুপায় হয়ে। নীতির দিক থেকে হিসাব করে যা অনৈতিক, দমন কার্যে তা ব্যবহার করা হচ্ছে নৈতিক বলে। চমৎকার যুক্তি।

আমরা অভাজন। মার্কস সাহেবকেও দেখিনি। পড়েছি তাঁর প্রণীত নীতির ব্যাখ্যা দলীয় প্যামপ্লেটে। তাই দলের ব্যাখ্যাই আমার ব্যাখ্যা, আমার কাছে মূলমন্ত্র।

নির্ঝরশীতল বলল, আপনারা যতই নিন্দামুখর হোন, সারা ভারত, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মানুষ আজ বামপন্থীকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছে।

এ থেকে তোমার কি মনে হয়?

ওরা ঠিক পথেই চলছে। নইলে সমর্থক আর সদস্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেত কি?

সেটাই ভাবছি, বলেই স্বকুল দম নিল।

বললাম, আর ভাবতে হবে না। হুনরা এদেশে এসেছিল পরাজয় স্বীকার করে এদেশেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকে। এরা হিন্দু সমাজের মল ধারায় মিশে গিয়েছিল। বর্তমান রাজস্থানী উগ্র হিন্দুরা সেই সব হুনদেরই বংশধর।

তৎকালের রাজধর্ম গ্রহণ করেই তারা হিন্দু ধর্ম ও আর্য সভ্যতার বিরাটত্ব প্রচার করে চলেছে।

আপনার যুক্তি অনস্বীকার্য।

আবার এল মুসলমান। আট হাজার সৈন্য নিয়ে ভারত জয় করল তারা। দেশের রাজা হল মুসলমান। আট হাজার মুসলমান আট দুগুনো ষোল হাজার বিবি সংগ্রহ করে মুসলমান সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। দেশের মানুষ দেখল রাজার ধর্ম গ্রহণ করলে অনেক সুখ সুবিধা। ব্যস্, হু-হু করে ধর্মান্তর ঘটতে থাকে। এরপর এল ইংরেজ, কৃশ্চান তারা। রাজার ধর্মের মহিমায় আবার আমরা যীশু ভজনায় নেমে পড়লাম দলে দলে। অর্থাৎ যার হাতে ক্ষমতা থাকে তাকে তোষণ করাই হল সাধারণ মানব ধর্ম। পশ্চিম-বাংলার ক্ষমতা আছে বামপন্থীদের হাতে তাই রাতারাতি রাজার ধর্মগ্রহণ করছে জনসাধারণ তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে। ভয়েও নয় ভক্তিতেও নয়, শুধুমাত্র স্বার্থ রক্ষা করতে। এতে নতুনত্ব তো নেই।

বামপন্থীদের মধ্যেও তো লড়াই চলছে।

চলছে এবং চলবে। হিন্দু রাজাদের সময় শাক্ত বৈষ্ণব শৈব বৌদ্ধ মতবাদীরা লড়াই করেছে। মুসলমানদের লড়াই চলেছে সিয়া-সুন্নী-কাদিয়ানীদের নিয়ে, কৃশ্চানদের লড়াই চলেছে ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট আর গ্রীসিয়ান চার্চদের নিয়ে। এখন লড়াই চলছে বামপন্থীদের মধ্যে। কেউ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট, কেউ মার্কস বি-বাদী কম্যুনিস্ট কেউ ফরওয়ার্ড ব্লক, কেউ আর-এস পি। এগুলো হল ইতিহাস। সবাই সর্বাধিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের ঘোরে চিৎকার করছে, সে আও হাতিয়ার।

এই কি চলবে চিরকাল?

পাগল। তা হলে পৃথিবী আর গোল থাকবে না চার কোণা হয়ে যাবে। সেই যে কবি গুরুর হিসাব: শক-হুন-মোগল-পাঠান এক দেহে হল লীন। এরাও একদেহে লীন হয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে অথবা তুলতে বাধ্য হবে। তবে নিকট ভবিষ্যতে নয়। শনৈঃ শনৈঃ পথ আবিষ্কৃত হবে, আর মানুষ নতুন জীবনের সন্ধান পাবে।

সেদিনের আনন্দ থেকে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হব।

হেসে বললাম, বঞ্চনার ইতিহাসে এটা সমুদ্রে বারি বিন্দু মাত্র। হয়ত কোন

রাজার রাজত্বে বাস করলে প্রচুর আনন্দ পেতাম। গণতন্ত্রে রাজা নেই তাই তা থেকে আমরা বঞ্চিত। তাই আগামী দিনের নতুন সমাজ ব্যবস্থার আনন্দ থেকেও হয়ত আমরা বঞ্চিত হব। তাতে আপশোষ করার কিছু নেই।

॥ আট ॥

ওরা ঝগড়া কোঁদল করে নিঃশেষ হতে চলেছে।

সবাই বলছে গৃহ বিবাদে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন গতায়ু। যদুবংশীয়দের নেতৃত্ব দেবার মত লোকের অভাব তাই নিজে নিজে মারামারি করে নির্বংশ হল যাদবরা। বর্তমানেও ভারতীয় কংগ্রেসরূপী যদুবংশ নেতৃত্বের অভাবে ঘরে ঘরে মারামারি হানাহানি করে ধীরে ধীরে নির্বংশ হতে চলেছে।

আমরা ভারতীয়। এই কারণেই মহাভারতের যদুবংশের অনুগামী। ধ্বংস হোক, তাতে ভয় নেই। আমরাও যাব বিপক্ষেরাও যাবে। পৃথিবী ভারমুক্ত হবে। এর পরই মহাপ্রয়াণ। ধর্ম সারমেয় হয়ে পথে ঘাটে ঘুরছে। মাঝে মাঝে কঠিন কষাঘাতে কেঁউ কেঁউ করছে। সেই ধর্মকে রক্ষা করতে যদুবংশীয়রা বহুকাল নানা ভাবে চেষ্টা করেছে। বিফল হয়ে সারমেয়কে ছেড়ে দিয়েছে পথে ঘাটে ধর্মকে রক্ষা করতে। ধর্ম রক্ষা হয়েছে কি?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে এসেছিল আমার অতি সজ্জন সুহৃদ অমূল্যবিকাশ দস্তিদার।

এসেই বলল, আজকাল ঘর থেকে বের হোস্ না বুঝি?

বললাম, অনেকটা তাই।

উৎসুক ভাবে বলল, কেন? কেন?

প্রথম কারণ বয়স, দেহটা ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে, পথঘাট জনাকীর্ণ, ধাক্কায় ধাক্কায় লাট্টুর মত পাক্ খেতে হয়; ট্রামবাসে উঠবার আগে বিষ্টু ঘোষের ব্যায়ামাগারে যোগব্যায়াম না শিখে এলে দেহটা চ্যাপ্টা হবার আশঙ্কাই বেশি, মনে হবে আখ মাড়াই হয়ে গেল, আর পকেটের রেস্তও তেমন কিছু নেই যে ট্যাক্সির আশ্রয় নিতে পারি। তাই জড়ভরতের অভিনয় করছি কয়েক বৎসর যাবত। কিন্তু এই পর্যটনের সামর্থ তোর আছে দেখে আমি নিরতিশয় আনন্দিত।

দস্তিদার বলল, তা বটে। দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে বের হতে হয়। উপায়

কি ? তোর তো কোন ভাবনা নেই। গৃহিণীহীন গৃহ, সংসারী না হয়ে সংসার। আমার তো তা নয়, শেষ বয়সে গরীবের কন্যাদায় থেকে রক্ষা করতে নিজের গরিবীকে ডেকে এনেছি। তাই মাঝে মাঝে দায় বহন করতে ল্যাংড়া ঘোড়ার মত ছুটতে হয়, মাঝে মাঝে পিছারি মারতে হয়। তবুও চলছি। কতদিন চলতে পারব কে জানে।

কেন ? আমি তো মনে করেছি সেনটেনারী করব।

তা পারবি না। বৈজ্ঞানিকরা বলেছে অবিবাহিত পুরুষ অথবা অবিবাহিতা নারীর চেয়ে বিবাহিত পুরুষ ও নারী বেশি দিন বাঁচে। সেনটেনারী আমাদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ সেনটেনারীর আশা পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক অবস্থাকে মেনে নে।

ঠিক বলছিস। এতদিন বাঁচা উচিত নয়। সামনেই প্লাবন, ভেসে যাবার সম্ভাবনা।

কিসের প্লাবন ?

ধ্বংসের। দেখছিস না, ধর্মের নামে লড়াই, বিচ্ছিন্ন হবার লড়াই, ছয় ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই, রেশনের লাইনে লড়াই, কেরাসিনের টিন হাতে করে লড়াই। শুধু লড়াই আর লড়াই। পরিণতি ধ্বংস। লড়াই করে রাবণ বংশ ধ্বংস, কুরুপাণ্ডব বংশ ধ্বংস, যদুবংশ ধ্বংস, তুর্কী-পাঠান বংশ ধ্বংস, মোঘল বংশ ধ্বংস, ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস, এবার ধ্বংস হব আমরা। এই ধ্বংসের প্লাবনে আমরা নিশ্চিত ভেসে যাব রে।

এই সব ভেবেই তোর কাছে এসেছি। তুই দেখছিস লড়াই আর ধ্বংস, আমি দেখছি ভারতের বিরাটত্বের ধ্বংস। গৃহ বিবাদে সবাই ধ্বংস হয়, আমরাও ধ্বংস হব ঠিকই কিন্তু এর শেষ কোথায় ?

শেষ ! আদিও যেমন নেই অন্তও তেমন নেই। কবে মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল, কবে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তাও যেমন কেউ জানেনা, তেমনি কবে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, কবে পৃথিবী ধ্বংস হবে তাও কেউ বলতে পারেনা, পারবেও না। কোথায় যে শেষ তা কেমন করে বলি। বরং তুই বল, আমি শ্রোতা।

অমূল্যবিকাশ অমূল্য একটি হাসি দিয়ে জানিয়ে দিল যদিও তার দন্তপাটি স্থানচ্যুত তবুও তার মানসিক গঠনে একটুও চিড় ধরেনি। সেই তিরিশ সালের অমূল্যজীবন আজও বেঁচে আছে তার সেই সরল মন আর সহজ জীবন নিয়ে।

বললাম, তোর হাসিটা বড়ই ভাল লাগল রে অমূল্য। মনে হয় আমরা সেই তিরিশ সালের কৈশোর যেন ফিরে পেয়েছি।

তা বটে, তা বটে। একটা ঘটনা ঘটেছে। বল দেখি কি করি।

ঘটনা না জেনে কি করে বলব।

তবে শোন, আমার 'ওয়াইফ্', মানে গৃহিণী সেদিন ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমার একুশ বাইশ বছরের সদ্য গুম্ফশোভিত পুত্রটি প্রেমে পড়েছে।

সে তো ভাল কথা।

কচু। বেকার ছেলে।

কোন কাজ নেই। পাড়ার মেয়েদের কাছে পেয়েই প্রেম নিবেদন করেছে. এটা এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়।

বউকে খাওয়াবে কি ?

যে চিনি খায় তাকে চিন্তামণি চিনি জোগায়। ঘাড়ে জোয়াল পড়লে ফুটপাতে কলাটা মূলোটা বিক্রি করেও বউয়ের ভাত জোগাড় করতে বাধ্য হবে। ওসব চিন্তা করিস না।

সেটা বড় চিন্তা যদি নাও হয় তাতে আপত্তি নেই কিন্তু চিন্তা অন্যত্র।

সেটা আবার কি ?

আমাদের সহপাঠী মহসীন আলির কথা মনে আছে ?

খুব। মহসীন আমাকে উপদেশ দিয়েছিল, বাদশাহের সঙ্গে লড়াই করা গুনাহ্। তারপর !

মেয়েটা মহসীনের।

ওঃ। সমস্যা তো খুবই কঠিন। আমাদের এই বিচিত্র দেশে সবই বিচিত্র। কিন্তু তাতে তোর আপত্তি কিসের ?

আমার নয়, মাই ওয়াইফের। দেবদ্বিজ ভক্তিপরায়ণা পতিব্রতা নারীর পুত্র যদি কোন মুসলমানের মেয়েকে গৃহবধূ করে আনে তাতে তার নিজের ধর্ম নষ্ট হবে, হয়ত পুত্র পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে চিরতরে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিস ?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল, আবিদা শুদ্ধি করে বিয়ে করবে।

তুই কি বললি ?

কিছুই বলিনি! ব্যাপারটা কম্যুন্যাল তাই চিন্তায় পড়েছি। তুই কি বলিস?

গম্ভীরভাবে বললাম, ঘটনাটা নতুন নয়। অনেক হিন্দুর ছেলে মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করছে। হাজার হাজার হিন্দু মেয়ে মুসলমানকেও বিয়ে করছে। সবক্ষেত্রেই রয়েছে ভালবাসার টান কিন্তু তার জন্য শুদ্ধির প্রশ্ন আসছে কেন? নতুন আইনে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহে ধর্মের কোন স্থান নেই। হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান মুসলমানই থাকবে। যে যার নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলমান মেয়ের জন্য শুদ্ধির যেমন প্রয়োজন নেই, হিন্দু মেয়ের জন্য তেমনি কলমা পড়ার দরকার নেই। এরা ধর্মীয় পতিপত্নী নয়, এরা আইনগত পতিপত্নী।

কিন্তু সমাজ পরিবার তা স্বীকার করবে কি?

করবে, তবে ঔষধ চিরকাল তিক্ত, গলধঃকরণ করতে প্রথমে একটু দ্বিধা থাকলেও রোগ নিরাময় ঘটবে। তুইও এই কাজটি নির্বিঘ্নে করতে পারিস। ধর্মের মুখোস খুলে ফেলতে হবে। ধর্মের অনুশাসনগুলো প্রবর্তিত হয়েছিল সমাজকে ন্যায় ও নীতি শেখাতে। ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত যে সব আইন প্রচলিত হয়েছিল তার পেছনে ছিল তৎকালীন সমাজবোধ। আজ সে সমাজবোধ কতটা কার্যকরী তা স্থির করার দায়িত্ব আমাদের। তাই এই সব আইনের সঙ্গে কোরাণ অথবা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের কোন সম্পর্ক নেই! আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে যে ভাবে সমাজ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে, ইসলাম শরীয়ত ঠিক একই ভাবে সমাজ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে সমাজ রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের প্রবর্তিত আইন সমাজকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে। সেটাই আমাদের পক্ষে উপযোগী।

অমূল্য বলল, কথাটা যুক্তিযুক্ত কিন্তু যারা ধর্মের নামে পাগল তারা যুক্তির ধার ধারে না। শরীয়তকেই মনে করে ধর্ম, স্মৃতিশাস্ত্রকেই মনে করে ধর্ম। কোরাণ যে ধর্ম শেখায়, যে মহত্ত্ব প্রচার করে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আইন কতটা সামঞ্জস্য রেখে চলছে তা ভেবে ঠিক করার দায়িত্ব যাদের তারা সঠিক ব্যাখ্যা করে কিনা সেটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য! আমাদের বেদের বাণী কি আমরা মেনে চলি, তার সঠিক ব্যাখ্যা কি স্মৃতিশাস্ত্রে আছে।

বললাম, এই ধর্মবিরোধ একটি সর্বনাশা খেলা। যারা খেলোয়াড় তাদের স্বার্থযুক্ত থাকে এই বিরোধকে জিইয়ে রাখতে। শান্তি প্রেম ও প্রীতির বাণী বহন

করে পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্র। অথচ ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা গোষ্ঠীগত স্বার্থে এই মহান আদর্শকে ধ্বংস করে থাকে। মনুষ্যত্ববোধকে হত্যা করে কোন ধর্মের মহিমা যারা প্রচার করতে চায় তারা এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী। অবশ্য প্রকাশ্যে সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এরা নিজেদের সব সময়ই প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। এটাই হল সর্বাধিক ট্রাজেডি।

অনেক তো আলোচনা হল, কিন্তু আমার পুত্রের বিয়ের বিষয়ে তোর শেষ কথা কি?

ওটা সাবালক ছেলে ও সাবালিকা মেয়ের ওপর ছেড়ে দে। বর করবে ওরা। ওরা নিজেদের ভালমন্দ চিন্তা করতে শিখেছে। ওদের বিচার বিবেচনায় ছেড়ে দে অমূল্য। ওদের ওপর কিছু চাপিয়ে দিস না। এতে ভাল হবে না। মহসীনকে নিয়ে একদিন আসিস। তার সঙ্গেও আলোচনা করে শেষ কথা তোরাই স্থির করতে পারবি।

অমূল্যবিকাশ ফিরে গেল।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

আমি কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। অমূল্যবিকাশ দাশগুপ্তের সমস্যা যে একটি জাতীয় সমস্যা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে স্কুল কলেজে পড়ছে, একসঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা দিচ্ছে। অভিভাবকের কতটা প্রভাব রয়েছে ছেলেমেয়েদের উপর তা স্থির করা কঠিন কিন্তু যৌবনের এই আবেগ কাকে কাছে টেনে নেবে তা বলা কঠিন, সেজন্য বিচারের দায় ওদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত মনে করি।

কাজের লোকটা আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে বলল, দাদাবাবু, চা খাবেন কি?

বললাম, নিয়ে আয়, আজকের খবরের কাগজগুলোও নিয়ে আয়।

কাগজ খুলে দেখছি শুধু খুন খারাপি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নারীহত্যার সংবাদ। এ সব ভিন্ন সারা ভারতের উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা ঘটছে না। জেনে আশ্চর্য হলাম। এত বড ভারতে সংবাদের মত সংবাদ কিছু নেই জেনে বেকুবের মত কাগজের দিক তাকিয়ে ভাবছিলাম, সংবাদ পত্রগুলো কাগজের কাটতি বাড়াতে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করে যার সামাজিক মূল্য অতি নগণ্য।

অনাচার অত্যাচার আর রক্তপাত ঘটিয়ে সমস্যা সমাধান হয়নি কোন কালেই !

চিন্তায় বাধা দিল পাশের ফ্ল্যাটের দুর্গাপ্রসাদ বেহানী।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, আসতে পারি ?

অবশ্যই। বসুন।

বেহানীজি বসলেন। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারছিলেন না।

পেছন পেছন তাঁর স্ত্রী সুমিতাকুমারী এসে দাঁড়ালেন তাঁর পেছনে।

বেহানীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলেছ।

বেহানী বললেন, বলিনি, ভাবছি কি বলব ?

যা ঘটেছে তাই বল।

শুনুন দাদা। জানেন তো আমার ব্যবসা আছে মানিকতলায়। ওখানে একটা দোকান কিনেছি। দোকানটা খালি। সেখানেই উঠে যাব স্থির করে বাড়িটা মেরামত করতে মিস্ত্রি মজুর নিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়িতে ঢুকতে পারিনি। পাড়ার কিছু ছেলে এসে বলল, দশহাজার টাকা না দিলে বাড়িতে ঢুকতে দেব না।

তারপর ?

গেলাম থানায়। বড়বাবুকে বললাম, বড়বাবু বলল, কিছু দিয়েটিয়ে মিটিয়ে নিন।

সুমিতা বল, বুঝুন। গুণ্ডারা হামলা করলে তাদের টাকা দিয়ে থামাতে হবে আর এই কাজে সমর্থন জানাচ্ছে পুলিশ।

কোর্টে যাননি কেন ?

একই কথা। কোর্ট পুলিশের হাতে তদন্ত করার দায়িত্ব দেবে। তখন আমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন। টাকার গন্ধ পেলে বার বার হামলা করবে। ভাবছি বাড়িটা বিক্রী করে দেব।

ভাল কথা। বাড়ি বিক্রী করলে আপনারা বাচবেন কিন্তু নতুন ক্রেতা তো রেহাই পাবে না। তাকেও দশ হাজারের খেসারত দিতে হবে। একটা কথা বার বার আমার মনে হয়েছে। সেটা হল শান্তিরক্ষার দায়িত্ব রয়েছে যাদের উপর অর্থাৎ পুলিশের উপর তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হল সমাজবিরোধীরা। পুলিশকে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে সমাজবিরোধীদের কাছে। অবশ্য সমাজ-

বিরোধীদের প্রাপ্তির সঙ্গে পুলিশের প্রাপ্তিযোগ থাকাই সম্ভব।

সুমিতা বলল, আমাদের কি সমাজবিরোধীদের দয়াতে বাঁচতে হবে?

এটা আংশিক সত্য।

কোন বিচার পাব না?

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সেটা সম্ভব কিনা বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় আপনারা আরও উঁচু তলায় গিয়ে আবেদন করলে ফল পাবেন। উঁচু তলার মানুষ যে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির তা বলছি না, তবে তাদের কিছুটা চক্ষু লজ্জা আছে, যা নীচুতলায় নেই।

বেহালা দম্পতি নিরাশ হয়েই ফিরে গেলেন। কিন্তু সমাজবিরোধীরা যে stronger force than Police administration এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র জনমত গঠন করে এদের সঙ্গে লড়াই করা যায় কিন্তু জনমত গঠনের মত সংগঠন কোথায়?

অচিরেই সংবাদ পেলাম দমদমের কোন একটি এলাকায় পথ অবরোধ করেছে স্থানীয় জনসাধারণ, কারণ সমাজবিরোধীদের সংযত করতে হবে।

বলা বাহুল্য রাস্তা অবরোধ উঠিয়ে দিতে পুলিশ এসেছিল এবং মৃদু লাঠি চার্জ করে জনতাকে হটিয়ে দিয়েছিল অবশ্য সমাজবিরোধীদের হটাবার কথা শোনা যায় নি।

ঠিক একইভাবে জমি চোরদের সাহায্য করে এসেছে প্রশাসন।

জমিদারী প্রথা উঠে গেল।

উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের দেবার নীতি গ্রহণ করা হল।

কাগজ কলমে দেখা গেল জমিদারদের জমি আত্মীয় স্বজনদের নামে আগেই ভাগ করে দেওয়া রয়েছে। একই পরিবারের ছেলেমেয়ে চাকরবাকরের নামে এমনভাবে জমি বণ্টন করা আছে যার ফলে উদ্বৃত্ত জমির কোন হদিসই পাওয়া যায় নি। এই সব জমি চোরদের জমি যখন চাষীরা দখল করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হল তখন প্রশাসন পুলিশ পাঠালো আন্দোলনকারীদের দমন করতে, জমি চোরদের শায়েস্তা না করতে। সৃষ্টি হল নতুন শোষক শ্রেণী জোতদার।

জোতদাররা এত জমি পেল কোথায়? কতটা তার প্রাপ্য? কতটা তার প্রয়োজন এ হিসাব নেবার সরকারী যন্ত্র নেই কিন্তু চোরকে আটক করলেই লাঠি নিয়ে ছোটে পুলিশ।

এই অনাচার ও অবিচারই জন্ম দিয়েছিল নকশাল আন্দোলন। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান ও কৃষি নির্ভরশীল। চাষীরা চায় জমি, জমিতে অধিকার। তা যদি কেউ দাবী করে তা কি অন্যায়?

কিন্তু সরকার চাষীর দাবি তো মেনে নেয় নি।

দাবীদাররা পরিণত হল সমাজবিরোধীতে, স্থান হল শ্রীঘরে। আর যারা জমি চুরি করে দুধেভাতে জমজমাট তারাই হল জন প্রতিনিধি।

প্রভাকর বর্ধন মরল। রাজা হল রাজ্যবর্ধন।

রাজ্যবর্ধন লড়াইতে হ'ত হল। রাজা হল হর্ষবর্ধন।

হর্ষবর্ধন মরলে কে রাজা হল?

সাবলীলা রায় সমাদ্দার হেসে বলল, গোবর্ধন।

বেশ সমঝদার তো তুমি। শিবরামের বইগুলো ভাল করে নিশ্চয়ই পড়েছ।

আহা বেচারা।

কে বেচারা?

গোবর্ধন। শিবরামের গোবর্ধন নয় দাদা। চৌরিগাছার গোবর্ধন। মাঝে মাঝে আসে আমার নির্ঝরের বাবার সঙ্গে, খুব রসিক লোক। তখন বয়স আর কত হবে। এই ধরুন তিরিশ। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নাম তো গোবর্ধন। হেসে বলেছিল, হা দিদিমণি, আমার বাবার গোমাতারা নিত্য বর্ধিত হচ্ছিল তাই আমার নাম রেখেছিলেন গোবর্ধন। তবে বাবা মারা যাবার পর গো সংখ্যা কমতে কমতে অবশিষ্ট রয়েছি আমি গোবর্ধন। নামটাই সার, আর সবই অসার।

সাবলীলা যেভাবে বলল তাতে পাশে বসা মুকুল হেসে উঠল।

হাসবেন না মুকুলদাদা। বলেছিল, এখন আটকে পড়েছি আপনার শ্বশুরমশাইয়ের গোয়াল ঘরে। মাঝে মাঝে মাঠে ছেড়ে দিয়ে দড়ি খুঁটো দিয়ে চড়তে দেয় তাই আপনাদের ছিরিচরণ দেখতে পাই। আজকাল কর্তামশাই নিতাই ভজনায় দেহ মন প্রাণ দিয়েছেন তাই গো বধ না করে গো-বর্ধনে আবার মন দিয়েছেন। নইলে কি দেখতে পেতুম আপনাদের ছিরিচরণ।

মুকুল বলল, তাকে বেচারা কেন বলছেন?

কোন চারা নেই। চারা থেকেই বৃক্ষ। চারা থাকবে কি করে। নিজেই

বৃক্ষ ফলবান নয়। বে-চারা গোবর্ধন বহু কলা কৌশল করে একটা বউ সংগ্রহ করতে পারেনি আজও।

আমি বললাম, গোবর্ধন এখনও যখন জীবিত, আশা ছাড়েনি নিশ্চয়।

এই হতভাগা বাংলাদেশে মেয়ের অভাব আছে কি! ঠিক পেয়ে যাবে একটা।

সুকুল কথা শেষ করতেই সাবলীলা বলল, আদমসুমারীতে বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা কম। অত সহজে বউ সংগ্রহ হবে না।

বউ সংগ্রহ হবে। গরীব ঘরের মেয়েরা উপযুক্ত স্বামী পাচ্ছে না তাই অবাঙ্গালীদের ঘরে গিয়ে সংসার পেতে বসছে। অবশ্য এটা বাংলার কথা নয়, সারা ভারতের কথা। স্বজাতি স্বশ্রেণীর পাত্রের অভাবে বয়স্ক মেয়েরা যাকে সামনে পাচ্ছে তার গলাতেই মালা দিচ্ছে।

সুকুল হতাশভাবে বলল, দাদা ঠিকই বলেছেন। কলকাতার নতুন জমিদারদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন এই জমিদারদের ঘরের কথা কত করুণ আর রোমাঞ্চকর।

বললাম, নতুন জমিদার!

ছিরু সরদার এসেছিল দক্ষিণ থেকে। ছিরুর বাবার ছিল একটা মেটে ঘর আর একটা খেপ জাল।

বুড়ো গামাই সরদার মরার সময় সম্পত্তি দুটো ছিরুকে দিয়ে বলেছিল, এই রইল। খেটেখুটে খাবি। বিয়ে করবি। বুঝলি।

ছিরু খেটে খুটে খেত কিন্তু বিয়েটা ঠিক মত করে উঠতে পারেনি। বাবার দেওয়া খেপ জালটা যখন ছিঁড়ল তখন নতুন জালের পয়সা ছিল না ট্যাঁকে।

তারপর?

ফইম মিঞা বলল, ছিরু তোর কষ্ট দেখে কি করব ভাবছি।

ছিরু মাথা নীচু করে বলল, তুমিই বল। সারা বছরে জোতদারের জমিতে মজুর খেটে যা পাই তাতে চার মাসের খোরাক হয়। বাকি আট মাস জাল মেরে খেতাম। তাও বন্ধ।

আমার দলে আসবি।

ছিরু দলে ঢুকে পড়ল।

নানা গাঁয়ের আঠারজনের দল। কেউ কাউকে ভাল করে চেনে না। চেনে একমাত্র ফইম।

দলের কাজ রাতের বেলায়। দূর-দূর গাঁয়ে কাজ। খবর আনে দলের লোকেরা। অন্ধকার রাতে রে-রে করে ঢুকে পড়ে গেরস্ত বাড়িতে। হাতের কাছে যা পায় নিয়ে গা ঢাকা দেয়।

এই জীবনকে ছিরু মোটেই সহ্য করতে পারত না। আবার ফইমের ভয়ে দল ছাড়তেও পারত না। হঠাৎ একদিন গাঁ ছেড়ে ছিরু বেরিয়ে পড়ল। হাজির হল উত্তরের রেল স্টেশনে।

কদিন আগে গেরস্ত বাড়িতে ছিরু ডাকাতি করেছে। তার ডাকাত মনটা কিছুটা থিতিয়ে এসেছিল। এখানে এসে দেখল, ফইমের দল রাতে ডাকাতি করত আর এখানকার মানুষ দিনে ডাকাতি করছে। বিশ রশি মাপের মাঠ এপার ওপার করলেই পয়সা। অনেক পয়সা। ছিরুর পুরনো মনটা আবার সজাগ হল। এবার নিজেই নেমে পড়ল এই দিনের ডাকাতিতে।

এও সহ্য হলনা ছিরুর।

হঠাৎ পুলিশ সতর্ক হল। তাড়া করল দিনের ডাকাতদের। অনেক মাল বাজেয়াপ্ত হল। অনেকের কোমরে দড়ি পড়ল। এবার ছিরু সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। ছিরু উত্তর ছেড়ে সোজা হাজির হল কলকাতায়।

ছিন্নমূল মানুষের বড় তীর্থস্থান শেয়ালদা স্টেশন।

রাত বারটা বাজলে স্টেশন থেকে কোন গাড়ি বের হয় না। রাত বারটার পর কোন গাড়ি স্টেশনে ঢোকে না। এলাকাটা কেমন নিস্তব্ধ আর নির্জন হয়ে ওঠে। এদিকে ওদিকে কয়েক শ মেয়ে পুরুষ ঝুপড়ি ঝোপড়ার তলে আশ্রয় নেয়। বেশ নিরিবিলি।

ছিরু সরদার একটা দেওয়ালের পাশে অন্ধকারে মাথা গুঁজে শুয়েছিল। কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছিল তা সে জানে না। হঠাৎ তার মাথার তলা থেকে কে যেন তার পোটলাটা টেনে নেবার চেষ্টা করতেই ঘুম গেল ভেঙে। লাফিয়ে উঠে চেপে ধরল চোরকে। চোরও বিকট চিৎকার করে উঠতেই ছিরুর হুঁশ হল। চোর পুরুষ নয়, নারী। মেয়েমানুষের চীৎকারে এখুনি হয়ত ভীড় জমে যাবে। ছিরু নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, চেল্লাচ্ছিস কেন ?

তুই আমাকে চেপে ধরলি কেন ? তোকে পুলিশে দেব।

আরে মাগী। তুই চুরি করছিলি আর পুলিশে যাব আমি। চল থানায়।

থানায় নাম শুনে চমকে উঠল মেয়েটা।

তোর তো কিছু নেই নি।

নেবার জন্যই তো পোঁটলা ধরে টানাটানি করছিলি। কতদিন এ কাজ করছিস্?

মেয়েটা বলল, ছেড়ে দে।

ছাড়বনি। কোথায় থাকিস্? তোর নাম কি?

অবলা। বউবাজারের ফুটে থাকি।

আর কে আছে তোর দলে।

দল। দল নেই রে। পেট চলেনা তাই এইভাবে চুরি করি। রাতের বেলার খদ্দের খুঁজে বেড়াই। না পেলে পেট মানে না। চুরি করি।

ছিরু সরদার অবলার হাত ধরে টেনে বসাল তার পাশে।

কতদিন এইছিস গাঁ থেকে।

তা তিন চার বছর হবে। গাঁয়ে তো কেউ নেই। বাবা মরার পর মা আবার বিয়ে করে চলে গেছে। আমাকে নে যায়নি। কি করব বল। সেয়ানা হতেই গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে চলে এলাম কলকাতা।

তোকে আর খদ্দের খুঁজতে হবেনি। ঘর করবি?

করব। কিন্তু ঘর কোথায়?

কেন, তুই যেখানে থাকিস?

সে তো ফুটপাত।

ফুটপাতেই ঘর করব। কাল চল কোন কালীবাড়ি গিয়ে মালা বদল করে আসব। তুই তখন হবি আমার বউ। আর পেটের জন্য খদ্দের খুঁজতে হবে না তোকে; বুঝলি।

সবই বুঝল অবলা। বলল, পালাবিনা তো? পেটে বাচ্চা এলেই মরদরা পালায়।

নারে না। তোর কোন ভয় নেই।

সব শোনার পর বলল, আমি কিন্তু মোল্লা। তোকে ঠিক নাম বলিনি।

ধ্যুৎ। তুই অবলাই হোস আর দুর্বলাই হোস, তুই তো মেয়েমানুষ। কালীবাড়ি মালাবদল করলে তোর নাম অবলাই থাকবে। তোর গায়ে তো

মোল্লার ছাপ নেই। মন ঠিক কর।

বেশ আমি রাজি।

ছিরু তার বউ নিয়ে ফুটপাতে আস্তানা নিয়েছে। বছর ঘুরতেই অবলার কোলে এল আবুলি। একটা কচি টক্‌টকে মেয়ে।

অবলা খুশী। খুশীর আমেজে হাসপাতাল থেকে এসেই প্ল্যাসটিকের কাপড় কিনে ছাউনি তৈরী করেছিল ফুটপাতে।

এই জমিদারীর মালিক অনেকেই। ভাগবাঁটোয়ারা করে রাত কাটায় ছিরু সরদারের মত আরও কয়েক শ' মানুষ, যাদের একাংশ হল স্বামী-স্ত্রী। কবে কোথায় তাদের বিয়ের পিঁড়ি সাজানো হয়েছিল তা সবারই প্রায় অজ্ঞাত। নতুন যারা মালা বদল করে আসে কোন কালী মন্দির থেকে তাদের কিছু হদিস পেলেও কোন দিন কেউ জিজ্ঞাসা করে না তাদের পরিচয়।

তাদের এই ফুটপাতের জমিদারীর ওপরওলা হল পাড়ার মস্তানরা। তারা প্রতিদিন ট্যাকস আদায় করে পঞ্চাশ পয়সা করে। এই ট্যাকসের একাংশ যায় পুলিশের পকেটে। যারা সামান্য আপত্তি করে তাদের স্থানচ্যুত করে মস্তান ও পুলিশ। তাদের সংসার মাথায় করে নতুন কোন জমিদারীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়।

এরা সবাই বাংলার মানুষ নয়। সংখ্যায় অবাঙ্গালীই বেশি। অবাঙ্গালীদের অনেকেই একক আসে। বিশেষ করে বিহার রাজ্যের লোকের ভীড়টাই বেশি। তারাও একটা চট অথবা চাটাই পেতে নেয় ফুটপাতে। শহরের দোকান বন্ধ হলে ফুটপাতে তিনখানা ইঁটের উনুন পেতে সারাদিনের সঞ্চয় দিয়ে আহারের ব্যবস্থা করে।

বিহার থেকে যারা আসে তাদের অধিকাংশই অন্ত্যজশ্রেণী। এ মুলুকে ওদের মাথা গোঁজার স্থানও নেই, যাদের সামান্য কিছু আছে তারাও রাজপুত, ব্রাহ্মণ, ভূমিহার আর যাদবের অত্যাচারে জরুবিবি নিয়ে পালিয়ে আসে পেটের দায়ে কলকাতায়। এখানে ঠেলা আছে। রিক্‌সা আছে। মোট বইবার সুযোগ আছে আর আছে মোবাইল হোটেল যেখানে অল্প ব্যয়ে ছাতু চাটনি দিয়ে সহজেই পেট ভরাতে পারে।

সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এদের জাত ধর্ম এক নয় কিন্তু ফুটপাতে এদের এসবের বালাই নেই। রামবারিয়া সেলিমাকে নিয়ে যেমন ঘর

বাঁধে তেমনি আবদুল ঘর বাঁধে পাঁচুবালাকে নিয়ে। ওদের একটিই ধর্ম। সে ধর্ম হল ওদের পেট আর সৃষ্টির উন্মাদনা। এর বেশি কিছু ভাববার অবসর ওদের নেই।

সাবলীল বাধা দিয়ে বলল, আপনি এই নতুন জমিদারদের বেশ ভাল ভাবেই অনুধাবন করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

ঠিক মত অনুধাবন করতে পারিনি মিসেস রায় সমাদ্দার। একটু রাত হলেই দেখতে পাবেন অন্ধকার ফুটপাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গণ্ডায় গণ্ডায় যুবতী। তার লোভনীয় সাজসজ্জা খদ্দেরদের আকর্ষণ করে। এই দৃশ্য রোজই দেখতে পাবেন কলকাতার বিশেষ বিশেষ এলাকার। এরা কারা? এ প্রশ্ন জাগে কি মনে? এরা এসেছে অনাহারী পিতামাতার ভার লাঘব করতে। অনেকে এইভাবেই পিতামাতার কষ্ট লাঘব করতে মাঝে মাঝে টাকাও পাঠায়।

সুকুলকে থামতে হল।

বললাম, মিসেস রায় সমাদ্দার তো নারীমুক্তির জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছ, এদের মুক্তির কথা ভেবেছো কি? তোমার শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে গবেষণার চেয়ে এদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে গবেষণা করে যদি সমাজকে এই পাপমুক্ত করার পথ খুঁজে বের করতে পার তা হলে বোধহয় নারীমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজও রক্ষা পায়।

আপনি ঠাট্টা করছেন দাদা?

ঠাট্টা নয়। এটাই হল বড় সমস্যা। এই সমস্যার পটভূমি তৈরী করে দারিদ্র, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা। এর জন্য কতটা চিন্তা করে দেশের মানুষ, সেটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। আমরা দেখছি, অনুভব করছি, মনে মনে গজরাচ্ছি, যা করণীয় তা করছি না।

আমার কথা শেষ না হতেই সুকুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শুনতে পাচ্ছেন দাদা।

শুনছি। ওরা কি বলছে! যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। সবাই শান্তি চায়। আমরাও চাই।

কিন্তু যারা শান্তির জন্য জীগির দিচ্ছে তারা সত্যিই কি শান্তি চায়? আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, ঘর জ্বালানি পর ভোলানি। ওদের দেখে তাই মনে হয়।

আপনার মন্তব্য বড় কঠোর এবং অযৌক্তিক। সাবলীলা মৃদু প্রতিবাদ জানাল।

তা বলতে পারেন। সকাল বেলায় খবরের কাগজ খুললেই দেখবেন, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক অথবা অন্য কোন কারণে কতগুলো নরহত্যা ঘটছে আমাদের দেশে। এটা কি শান্তির লক্ষণ? আর যদি লড়াই বন্ধ করতে হয় তাহলে বিশ্বের লডাইয়ের চিন্তার চেয়ে ঘরের লড়াই আগে বন্ধ হওয়া দরকার।

ওরা কিন্তু এসব কথা বলছে না।

বলছে কিনা জানিনা। তবে যখন কংগ্রেস ছিল ক্ষমতায় তখন বামফ্রন্ট চিৎকার করছে তাদের বহু কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এখন কংগ্রেস উল্টোটা বলছে। আবার ঘরোয়া ঝগড়া নিয়ে বাম ও ডান উভয় পক্ষই ব্যতিব্যস্ত। শান্তিতে ওরা বাস করতে পারছে না। এটা হল ছোটখাট কথা, বড কথাটা হল পাঞ্জাবে ধর্ম ও রাজনীতির প্যাচে শত শত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, লুট পাট চলছে। সেখানেও শান্তি নেই।

সুকুল থামল।

বললাম, এটা দিয়ে বিশ্বের শান্তির পরিমাপ করতে চাও বুঝি।

নিশ্চয়। যারা নিজের ঘর সামলাতে পারে না তারা বিশ্বের শান্তির জিগীর তুললে কেমন ব্যঙ্গ মনে হয়। গোটা ভারতই আজ সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, রাজনৈতিক কারণে অশান্তির আগুনে পুড়ছে আর যদি কোন কালে আমেরিকা অথব রাশিয়া আণবিক যুদ্ধে মেতে উঠে অথবা নক্ষত্রযুদ্ধ আরম্ভ করে তার চিন্তায় ওরা পাগল হয়ে উঠেছে। আমরা কি এতই বোকা! আমরা দেখেছি নাগাসাকি-হিরোশিমার মর্মন্তুদ ঘটনা। এটাই তো জানিয়ে দিয়েছে বিশ্বযুদ্ধ আবার যদি আরম্ভ হয় তা হলে বিশ্ব নামক গোলাকার বস্তুটির কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

বললাম, আশঙ্কা রয়েছে বলেই শান্তির কথা বলছে।

যারা বলছে তাদের ঘর সামলানোই বড় কাজ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শুকনো উপদেশ যারা দিচ্ছে তারা কাদের স্বার্থে এই উপদেশ দিচ্ছে তা আমাদের অজানা নেই! এভাবে কি বিশ্ব শান্তি বজায় থাকবে? যুদ্ধ চাই না, ইরাণ-ইরাক কয়েক বছর ধরে লডাই করছে তাদের শান্ত করতে পারেনি গোটা বিশ্ব। ইজরায়েল দিনের পর দিন অত্যাচার করছে প্যালেসটাইনের মুক্তিকামী মানুষের ওপর। কি

করতে পেরেছি আমরা ?

বললাম, তোমার বক্তব্য ও যুক্তি অস্বীকার করছি না, তবুও বলব যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। তবে সেটা কবরের শান্তি না হয়, এটাই কামনা।

আবার শোনা গেল জোর চিৎকার, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।

মুকুল ও সাবলীলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের জাগির শুনছিল। ফিরে এসে বলল, আমরা যাচ্ছি দাদা।

ওরা চলে যেতেই ভাবলাম, এবার আমার শান্তি !

শান্তি কি সহজ প্রাপ্য বস্তু !

অশান্তি না থাকলে শান্তি কি চাইতাম কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, গোষ্ঠীগত জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে—কোথাও তো শান্তি নেই। শান্তি নেই বলেই অশান্তিকে অতি নিকটজন মনে করে দুঃখ দারিদ্র, অবমাননা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে আজও মানুষ বাঁচতে চায়। এমন সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায় না। রাতের আঁধার আছে বলেই উষার প্রত্যাশা করি। এই তো মানবজীবন।

শক্তির আধার দেহ, শান্তির আধার মন। শক্তি ও শান্তির সমন্বয় ঘটে দেহ আর মন বোঝাপড়া করে সমন্বয় ঘটাতে পারল।

মন বলছে, যুদ্ধ নয়, দেহ বলছে লড়কে লেঙ্গে।

সমন্বয় নেই।

তাই বিশ্বশান্তির কথা বলি ঘরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালন করি না।

ওরা বলছে, যুদ্ধ নয় শান্তি।

এরা বলছে আমরা মার্কসীয় চিন্তার ছাত্র। আমাদের সমস্যা আর রাশিয়া চীনের সমস্যা এক নয়। আমরা আমদের দেশের উপযোগী করে আমাদের অধীত বিদ্যা প্রযোগ করব। ওরা বলছে, যুদ্ধ নয়। আমরা বলছি একই কথা যুদ্ধ নয়। এখানে আমরা একই কথা বলছি। ওরা বলছে যুদ্ধ নয় অথচ যুদ্ধের জন্য ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রকাশ্যে বলছে, আমরা অস্ত্র সংহত করছি। আমরাও ওদের গলায় গলায় মিলিয়ে বলছি যুদ্ধ নয়, কিন্তু প্রস্তুতিতে কোন ভুল করছি না। ওরা বলছে শান্তি চাই, আর শান্তির পায়রা উড়িয়ে গোপন স্থানে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। আমরা বলছি শান্তি চাই, কিন্তু গৃহের শান্তি

বজায় রাখতে নির্বিচারে নরহত্যা করছি। তবুও আমরা ওদের বরকন্দাজ নই, আদের সমস্যা আমাদেরই, ওদের সমস্যার চেয়ে ভিন্ন।

বাগাড়ম্বরের দেশে শুনবে, বলবে না, বললেই উল্টো ফল ভোগ করতে হবে।

সুকুল এসে বলল, বিশ্বনাথ প্রতাপ কি বলেছেন জানেন।

বললাম, রাজার ছেলে অনেক কথাই বলতে পারেন। তালপুকুরে এখন ঘটি ডুবছে না তাই মাঝে মাঝে জাঁগির দিচ্ছেন।

আহা, ওটা বলছেন কেন? বিশ্বনাথ খাটি লোক। চোরাই টাকা উদ্ধারের জন্য শহীদ হয়েছে, তাকে ছোট করে দেখা মোটেই উচিত নয়। বিশ্বনাথ বলছেন, চোরাবাজারীদের, বিদেশী ব্যাঙ্কের টাকা নিকাল দেও, আর কংগ্রেসীরা বলছে বিশ্বনাথকে নিকাল দেও। এরপর আর কিছু বলার আছে কি?

বলার থাকলেও বলা উচিত নয়!

চীন ভারত যুদ্ধের কথা মনে আছে কি? ভারতীয় সৈন্যরা হিমালয়ের বরফে জমে গিয়েছিল। তাদের পশমের পোষাকে ছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভেজাল। ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল ভেজাল মালের জন্য। যারা ভেজাল সরবরাহ করে ছিল আর যারা উৎকোচ পেয়ে সেই মাল সাচ্চা বলে চালিয়েছিল তাদের কেউ ক্ষমা করতে পারে কি?

বললাম, ভারতীয় জীবনে উৎকোচ একটা সম্মানীয় ট্রেড। উৎকোচ পেলে আমরা কতটা নাস্তিবাদ, হতাম তা বলা কঠিন।

সেটাই তো বিশ্বনাথ বলছেন। সুইডেন থেকে নিম্নমানের অস্ত্র ক্রয় করে যারা কোটি কোটি টাকা উৎকোচ নেয় তাদের শাস্তি দাও।

বললাম, সুকুল তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে। চীন-ভারত যুদ্ধ হয়েছিল জওহরলালের রাজত্বকালে। যারা পরাজয়ের জন্য দায়ী তাদের কজনের শাস্তি হয়েছিল বলতে পার? ইন্দিরার অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশন যখন আয়কর চোরদের হাতে মাথা কাটার উপক্রম করেছিলেন তখন গণেশনের কি অবস্থা হয়েছিল জান? গণেশনের চাকরি গেল এবং ভারতীয় নেতারা রাজনীতি থেকে তাকে বিদায় করেছিলেন সুলতানা ইন্দিরা। রাজীব এই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। বিশ্বনাথ চোর ধরতে গিয়ে চাকরি হারিয়েছেন তবে গণেশনের মত

রাজনীতি থেকে বিশ্বনাথকে বিদায় করা সহজ কাজ নয়।

মুকুল বলল, রাজনীতিতে সবই সম্ভব।

বললাম, বিশেষ করে ভারতীয় অপরাজনীতিতে সবই সম্ভব।

ঠিক বলেছেন দাদা। কোথায় যেন একটা গোপন বোঝাপড়া রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দুটো বড় বড় দলের। আদালতের পরোয়ানা জারী করার ক্ষমতা নেই পুলিশের, কারণ প্রশাসন তা চায় না।

বললাম, যা বলতে চাও তা বুঝেছি। ভুবন তিনটি। উপরে দেবতা, মাঝে আমরা আর পায়ের নীচে পাতাল। ভারতীয় রাজনীতির উপরতলার দেবতা দিল্লির বাদশাহরা, মাঝের তলায় রয়েছে রাজ্যের সুবেদাররা। বাদশাহের কৃপা বঞ্চিত হলেই সুবেদারদের পাতালের বিবরে প্রবেশ অনিবার্য। তাই মাঝের তলার সুবেদারদের বাদশাহের নফরদের সঙ্গে পরোক্ষ স্তাবকতা করতে হয়। উদ্দেশ্য গদী কায়েম রাখা। তাই নেপথ্যে গোপন ব্যবস্থা থাকে যাতে সুবেদারী কায়েম থাকে। নইলে আদালতের পরোয়ানাকে পরোয়া না করে প্রতিপক্ষ বুক ফুলিয়ে চলতে পারত কি।

আমাদের কথা শেষ হবার আগেই রাস্তায় শোরগোল শোনা গেল।

দাবী আদায়ের মিছিল।

চটকলের লক্ষাধিক শ্রমিক বেকার।

তাদের মিছিল।

মিল বন্ধ। খুলতে হবে। কাজ দিতে হবে।

বৃথাই ওদের চিৎকার। মিল খোলাবার দায়িত্ব কার? মালিকের? রাষ্ট্রের?

কেউই দায়িত্ব বহন করতে চায় না। মালিক আর প্রশাসনের গাঁটছড়া বাঁধা। প্রশাসন বলছে, আজকালকার মালিকরা প্রগতিশীল। দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারে প্রগতিশীল মালিক তথা পুঁজিপতিরা।

অমূল্যবিকাশ ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, ওদের প্রগতির দাপটে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বেকার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ। এরা নাম লেখানো বেকার। যাদের নাম লেখাবার সুযোগ নেই অথবা কর্মসংস্থান কেন্দ্রের কর্মপদ্ধতিতে আস্থা নেই তাদের সংখ্যা কত তা কেউ বলতে পারেনি।

অমূল্যবিকাশ ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেছিল, ভোটের দালালরা ভোট

কাঙ্গালদের নিয়ে যখন দরজায় দরজায় ঘোরে তখন কত মিঠে কথা বলে।

বলেছিলাম, ওটাই তো স্বাভাবিক। এই কাজে ওস্তাদি দেখিয়েছিলেন শেরে বঙ্গাল ফজলুল হক। গ্রামে গিয়ে শুনলেন, গ্রামের প্রভাবশালী চাষী কিছুকাল আগে মারা গেছেন। কিন্তু তার উত্তরপুরুষরা এখনও বেশ প্রভাবশালী। ফজলুল হক গেলেন সেই মাতব্বরের বাড়ি। তার ছেলেদের ডেকে বললেন, তোমাদের আব্বাজান ছিলেন আমার জীগরি দোস্ত। তারপরই রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। বললেন, ওনার সঙ্গে মুলাকাত হল না ওনার মাজারে আমাকে নিয়ে চল। আমি জানজার নমাজ পড়ে খোদার কাছে দোয়া মেগে নেব।

অমূল্যবিকাশ বলেছিল, ভোটের জন্য ভোট কাঙ্গালদের এও একটা মনোজ্ঞ নাটক।

সবটা শোন। ফজলুল হক গেলেন তাঁর জিগীরি দোস্তের কবর খানায়। ওজু করলেন, কবরের পাশে মাতুর বিছিয়ে নমাজ পড়লেন। তারপর হক সাহেব যে বক্তৃতা দিলেন তাতে সমবেত মিঞা-মুছুল্লীরা গদগদ হয়ে গেল। ফজলুল হক ভোট পেলেন ও জিতলেন। অথও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (তৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) হয়েছিলেন।

তা হলেই বুঝতে পারছ ভোট-কাঙ্গালরা ভোটের নাটকে যে খেলা দেখায় তাতে ভড়কে যায় অশিক্ষিত ভোটাররা।

আজ মনে হচ্ছে, সব কলকারখানা খুলে দেবার অত বড় প্রতিশ্রুতিটা কোথায় ভেসে গেল ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করে। একটাও কলকারখানা খুলেছে কিনা এ সংবাদ আমাদের জানা নেই। ভোটের সময় ভোট কাঙ্গালরা হয় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ভোট-কাঙ্গালরা মনে করে সব কিছু তাদের আয়ত্তে। সবই সম্ভব। তাই অসম্ভব কিছুর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে ওরা লজ্জিত হয় না।

হেসে বলেছিলাম, তবে ওরা বেকুব নয়। অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা না থাকলে অসত্যের পসরা সাজিয়ে ভোট যুদ্ধে পাড়ি জমাতে পারে কি? এরপর জনগণের সরকার গিয়ে দুহাতে জনগণকে হটিয়ে দিয়ে পুঁজির মালিকগণের দরজায় ধর্ণা দেয় প্রগতিকে প্রগতিশীল করতে। আমরা বাহবা দিই।

॥ নয় ॥

একে একে নিভেছে দেউটি।

পশ্চিমবঙ্গের শিবরাত্রির পোড়া সলতে গুলো ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করছে।

আবু বরকত মহম্মদ আতাউল গণি খানচৌধুরী পপাত মমার।

পাদপ্রদীপ থেকে বিদায় নিলেন দুঁদে ব্যারিস্টার অশোক সেন।

রাজপুত্র বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং হঠাৎ কেন যে বিরূপ হয়েছেন তাই বলে বেড়াচ্ছেন লোক সমাজে।

মুসলাম মহিলাদের সম্মানজনক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে দেশে যিনি প্রথম বিদ্রোহ করেন সেই আরিফ মহম্মদ খান বিতাড়িত হবার আগেই পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

সবাগ্রে ইন্দিরা গান্ধীর অতি প্রিয়জন শ্রীমান প্রণব মুখুজ্যেকে বহিষ্কৃত করে বেকায়দায় পড়েছিলেন রাজীব গান্ধী। তবে জননী ইন্দিরা গান্ধী যেমন চিরকাল যাদের স্কন্ধে আরোহণ করে ক্ষমতার শীর্ষে উঠবার পরই সেইসব সাহায্যকারীদের কৌশলে ভূপাতিত করে গেছেন সেই একই পথে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। দেউটি নিভছে এ খেয়াল তাঁর নেই। তাঁর অনুগত অর্জুন সিংহের মাবেল প্যালেসের গোপন তথ্য ফাঁস করাতে বিদ্যাচরণ শুক্লাকে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন রাজীব গান্ধী তাঁর সেই সুযোগ মিলেছে সহজেই, বিদ্যাচরণকে অবিদ্যার ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে মোটেই বিলম্ব করেননি রাজীব গান্ধী।

তা হলে রইলো কি?

প্রতিষ্ঠান!

যতদিন কেন্দ্রে কংগ্রেস থাকবে ক্ষমতায় ততদিন ভাগ্যান্বেষী স্তাবকের অভাব হবে না। যখন কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মত ক্ষমতাচ্যুত হবে অন্যরাজ্যে তখন স্তাবকরা অংশীদারিত্বের ঝগড়ায় নিজেরাই খুনোখুনী করবে। এখন দিন খুব দূরে নেই। দেউটি নিভবে চিরতরে তার নমুনা সবার চোখের সামনে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের ভিত গেঁথে রয়েছে বালিয়াড়িতে। জনরোষের জোর দমকা বাতাসে প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন হয়ে ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় স্থান পাবে, এর বেশি কি কিছু আশা করা যায়!

আজ ভাবতে বসেছেন সেদিনের স্বাধীনতা যোদ্ধারা।

সবারই কেশদাম ধবল। বিচার বুদ্ধিটা পরিপক্ক। তাই আলোচনাটা বেশ রসালো আর জোরালো। কিন্তু আজ এই অদূরদর্শী মহানুভব ব্যক্তিমণ্ডলী বোধ হয় দেশের কথা ভুলে গেছেন, এঁরাও ভাবছেন, বাঁচার কথা। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা গুছিয়ে নিতে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগে আগ্রহী নয়।

সরকারী করুণার সন্ধানে আনাচে কানাচে তাঁরা ঘুরছেন। যাদের দেবার কিছু থাকে না তাদের নেবার স্পৃহাটাই প্রবল হয় জাগতিক নিয়মে।

এঁরাও একদিন ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আজ আর এঁদের কোন রশ্মি নেই, এঁরাও নিভু নিভু! কেন?

সংগ্রাম! কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, বড়ই পরিশ্রান্ত, মানসিক ভারসাম্য লোপ পেয়ে হতাশার শিকার সবাই।

যে প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে এঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সব কিছু ত্যাগ করে, অমূল্য যৌবনকে উপহার দিয়েছিলেন দেশ মাতৃকার সেবায় তাঁরা আজ হারিয়ে ফেলেছেন ঐতিহ্য। আজ প্রতিষ্ঠানের দিকে ফিরে তাকাতে সাহস পান না। তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন, বিগতযৌবন প্রতিষ্ঠান এখন হয়েছে স্বৈরাচারী ও স্তাবকদের আখড়া। রাষ্ট্র ক্ষমতা যার হাতে তার হাতেই প্রতিষ্ঠান, তাই একমাত্র গোকুলের কানুর মত একচ্ছত্র হয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের উপর, অনুগামী ও বিবাদীদের উপর। স্তাবকরা এতেই ধন্য। তাদের সাময়িক লাভের কোন প্রতিবন্ধক নেই।

ইতিহাস যেমন নিষ্ঠুর তেমনই লজ্জাহীন।

একই ঘটনা নানা ভাবে দেখা দেয় নির্লজ্জভাবে কিন্তু তার তাৎপর্য হয় বড়ই নির্মম।

স্তাবকতা করে যারা নসীবকে গুছিয়ে নেয় তাদের যবনিকা যখন আসে তখন আহা বলার লোক থাকে না! যারা তোষামদে গদগদ হয় তাদের যবনিকা যখন নেমে আসে তখন কালো পর্দার পেছনে দাঁড়িয়েও ভাগ্যের পরিহাসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বিচিত্র দেশে গতকাল যার পদলেহন করতে হুড়োহুড়ি পড়েছিল রাত পোহাতেই তাকেই পদদলিত করতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয় পদলেহীরা।

এবিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী মুকুল।

তবে কিছুটা আপশোষের অবসান ঘটেছিল সরকারী পেনসন পেয়ে।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, তোমার তো কোন অভিমান থাকা উচিত নয়।

অবাক হয়ে সুকুল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন দাদা?

সরকার তো তোমাকে সম্মান দক্ষিণা দিচ্ছে।

সুকুল 'ওঃ' বলে বিরাট একটা হাই তুলে বলল, তা বটে। আপনি বোধহয় মনে করেন, আমরা এই সম্মান দক্ষিণার জন্যই জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান দিনগুলো জেলখানায় কাটিয়েছিলাম!

আমি কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিনি।

পেছনে তাকিয়ে দেখবার সাহস না থাকলেও অনুভব করেছি। অনুভব করা আর তা বিস্তারিত ভাবে বলা তো এক কথা নয়।

কিন্তু নারীমুক্তির প্রবক্তাদের কথার জবাব দিতে পেরেছিলাম।

প্রতিদিন সকাল বেলায় খবরের কাগজ খুললেই বধূ হত্যা আর নারী নির্যাতনের ঘটনা পড়তে পড়তে ভেবেছি এর জন্য সর্বতোভাবে পুরুষরাই দায়ী কি? আংশিক দায়িত্ব নারীকে বহন করতে হয় না কি?

উত্তর একটাই।

কোন পক্ষই সম্পূর্ণভাবে দায়বিহীন নয়।

সাবলীলা রায় সমাদ্দার এসেছিল নির্মলাকে নিয়ে।

এর নাম নির্মলা সেন।

বললাম, ভাল, বস তোমরা।

আপনার কাছে এসেছি এর সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতে।

বললাম, খুব বুদ্ধিমতীর কাজ হয় নি।

কেন?

নারীবিহীন জীবন যাপনে যে অভ্যস্ত তাকে নারী সমস্যায় টেনে নিলে কোন ফললাভ হয় না।

অর্থাৎ আপনি এ বিষয়ে কোন কথা বলতে চান না।

নিশ্চয়ই বলব। তবে সমাধান দিতে পারব না।

সাবলীলা বোধহয় আমার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে নিয়ে বলল নির্মলা

সেন আমার পিতৃগৃহের প্রতিবেশী কন্যা। মোটামুটি উচ্চ বিত্তের ঘরের মেয়ে।

তারপর ?

বিয়েটা হয়েছিল একটু বেশি বয়সে। নগদ কড়িও কম ব্যয় হয়নি। কিন্তু স্বামীর ঘর করতে পারল না।

ভাল কথা। যদি জোর করে ঘর করত তা হলে ওর লাশ মোমিনপুরের মর্গে পাওয়া যেত। এখনও তো হৃদ্‌স্পন্দন আছে। অর্থাৎ সে মরে বাঁচেনি, পালিয়ে বেঁচেছে।

সাবলীলা বলল, অনেকটা তাই।

কিন্তু এতে তো নতুনত্ব নেই মিসেস রায়সমাদ্দার। নারী জাতির কথা কিন্তু নারী সমাজের তো কেউ আগে বলেনি। বলেছে পুরুষরাই। নারী শিক্ষার যে প্রসার ঘটেছে তার জন্য নারী সমাজের চেয়ে পুরুষ সমাজের অবদানই প্রায় সবটা। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটে।

কিন্তু এ বিষয়টা কিছুটা অন্য ধরণের।

ধরণ অন্য হলেও মুখ্যত ফলাফল একই। তবে মিসেস রায়সমাদ্দার মেয়েদের অর্থাৎ নববধূদের ওপর যারা অত্যাচার করে তাদের সংখ্যা কত বলা কঠিন কিন্তু তার শতকরা আশীজনই নববধূদের স্বামীগৃহের মহিলারাই এই অত্যাচারের হোতা। কেউ শাশুড়ি, কেউ ননদ অথবা তৎস্থানীয়রা! এসব ক্ষেত্রে পুরুষরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের হাতের যন্ত্ররূপেই কাজ করে। প্রধান কিন্তু মহিলারা।

সাবলীলা কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি। অবশেষে উঠবার আগে বলল, আপনার কথা আংশিক সত্য। অবশ্য শতকরা হার বোধহয় মহিলাদের বিপক্ষেই! কিন্তু পথ কোথায় ?

আইন। কিন্তু আমাদের দেশে তো আইন নেই। যদি কোন মহিলা অত্যাচারিত হয়ে প্রাণ হারায় অথবা আত্মহত্যা করে তখন পুলিসের কিছুটা টনক নড়ে। নইলে প্রতিষেধক কোন আইন আজও আমাদের দেশে হয়নি। প্রতিষেধক আইন করলেও তা প্রয়োগ করার সময় নানা সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে।

আপনার কাছে এসেছি পরামর্শ শুনতে, উপদেশ নিতে নয়।

সাবলীলার মন্তব্যে থমকে গেলাম।

নিরুপায়ের মত বললাম, কোন আইন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরামর্শ করলেই ভাল হয়। এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ।

সাবলীলা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেলেন।

সুকুল তখনও বসে।

বললাম, পেনশন আনার সময় হয়নি তোমার ?

হয়েছে। আগামী কাল যাব। তবে দাদা ভাবছি, সরকার পেনশন দিচ্ছে, কিন্তু আরও কয়েক বৎসর আগে দিলেই অনেক অসহায় রাজনৈতিক কর্মীকে অনাহারে মরতে হত না।

তোমার কথা ঠিক কিন্তু আমাদের বিচিত্র দেশে বিচিত্র ব্যবস্থা। যারা দেশের জন্য প্রাণ দিল, দুঃখ কষ্ট সহ্য করল তারা মরল স্বাধীন দেশে অনাহারে আর যারা দেশকে ইংরেজের দাসত্বে আটক রাখতে লড়াই করেছিল তারা কিন্তু পেয়েছে বাঁচার মত রসদ। আজও পাচ্ছে। তবুও ভাল, এখনও যারা বেঁচে আছে তারা অনাহারে মরবে না।

একেবারে নিশ্চিন্ত হবার কোন কারণ নেই !

তা বটে, বলেই সুকুল চুপ করে গেল।

বললাম, মোরারজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে একবার এই পেনশন বন্ধ করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে তারা কি পেনশন পাওয়ার জন্য লড়াই করেছে। তারা দেশপ্রেমিক। এই পেনশন তাদের মর্যাদা হানি ঘটাচ্ছে। ত্যাগের বিনিময়ে কিছু পাবার কথা ভাবাই যায় না।

সুকুল হাসতে হাসতে বলল, ঠিক বলেছিলেন মোরারজি। তবে মোরারজি বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, ভারতের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন, শেষ অবধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন একটিমাত্র যোগ্যতায়। সেই যোগ্যতা হল তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। নইলে তাঁর মত ব্রিফলেস উকিলের দাম ফুটো কড়িও হত না। যাঁরা আমাদের উপদেশ দেন, নীতিবাক্য শোনান কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে এঁরা কারও সদুপদেশ শোনেন না। নীতিবাক্য ওঁদের অভিধানে আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার না করেও তো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যেমন

রাজীবগান্ধী। ওটা বংশগত অধিকারে।

ওটা সবাই জানে কিন্তু সমর্থন করেনা! সুলতান-বাদশাহদের জমানা বদল হয়েছে কিন্তু তাদের আভিজাত্যের গরিমা আমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে আজও।

সুকুল আর বাক্যবিন্যাস না করে নিজের মনেই বলল, রাজনীতি ভাল নয়। এসব আলোচনা নিরর্থক।

বললাম, অবশ্যই। তবে যাদের দেবার তারা দেবেই, যাদের স্বার্থ হচ্ছে নেওয়া তারা নেবেই। এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

•

অনেকদিন পর নির্ঝরশীতল এসেছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি সংবাদ অধ্যাপক মশায়?

এবার পথে নেমেছি দাদা। বলেই নির্ঝরশীতল চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

বললাম, সবাইকেই নামতে হয়।

আমাদের কথাই আলাদা। আগের দিনে মুনিঋষির তপোবনে বিদ্যার্থী যেত। গুরুগৃহ ছিল তাদের পাঠ্য জীবনের স্থায়ী বাসস্থান। গুরুর সেবা, পাঠ গ্রহণ এই ছিল তাদের ধর্মকর্ম। জমানা বদল হয়েছে দাদা। আজ আর বিদ্যার্থীরা শিক্ষকদের সম্মান করে না, বিদ্যার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে লেনদেনের, যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল। তাও অনেকটা সহ্য করা গেছে কিন্তু শিক্ষকদের পথে নামতে হয়েছে পেটের দায়ে।

হেসে বললাম, শিক্ষকরাও তা হলে ট্রেড ইউনিয়নে বিশ্বাসী।

তা বিনা আর কি বলা যায় বলুন। আমরা তো কাজ বন্ধ করেছি। কলেজ গুলোতে ছেলে ভর্তি হচ্ছে, তাদের নাম খাতায় উঠছে কিন্তু পড়াবার লোক নেই। বিদ্যামন্দিরের দরজা বন্ধ।

লোকসান কার?

সবার। এটা জাতীয় বিপর্যয়।

কলেজে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের ভবিষ্যত কি? সবাই তো প্রথম একশত জনের একজন নয়, তাদের সবাই ধরতে গেলে গড়িয়ে গড়িয়ে উঁচু ক্লাশে পড়ার লাইসেন্স পেয়েছে। তাদের ভর্তি যারা করছে তারা কলেজের পরিচালক নয়, ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়ন যারা পরিচালনা করছে তারা ছাত্র নয়।

বলা যায়, তাদের অনেকেই কলেজেই পড়েনি কস্মিনকালে। এই সব ইউনিয়নকে মোটা হাতে দক্ষিণা দিয়ে ছাত্ররা ভর্তি হচ্ছে। মোটা হাতে দক্ষিণা দেবার সামর্থ ছাপোষা বাঙ্গালীদের আছে কি? তাই কলেজগুলোতে বাঙ্গালী ছাত্র কমছে, অবাঙ্গালী ছাত্র বাড়ছে, আর স্ফীত হচ্ছে ইউনিয়নের নেতাদের পকেট। এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকরা যদি পথে নামে তাতে কোন দোষ নেই।

আপনার কথাটা সত্য হলেও আমরা নিরুপায়। মাস্টারি করি তাই ওভাবে তো অর্থ উপার্জন আমাদের সাধ্যের বাইরে। একমাত্র পথ হল পথে নামা। তাই নেমেছি।

ছাত্রদের মূল্যবান কয়টা মাস নিষ্ফল হল, এর ক্ষতিপূরণ হবে কি?

ঠিক করেছি আমরা অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়ে ক্ষতিপূরণ করব।

সবই ঠিক কিন্তু বর্তমান সামাজিক অবস্থায় মানুষ হারাচ্ছে তার মর্যাদা। এই মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার মত কোন শিক্ষা তো হতে পারেনা যেখানে শিক্ষক, বিদ্যার্থী ও শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দল উপদল এমনভাবে সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ নড়িয়ে দিয়েছে যেখানে সুস্থ মনের মানুষ অসহায় হয়ে ওঠে।

নির্ঝরশীতল সমাদ্দার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, দলই তো সবনাশ করেছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার ধুয়া এত প্রবল তুলেছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বহু দলের আবির্ভাবে।

বললাম, মহাপুরুষরা বলছেন, যত মত তত পথ।

না দাদা, মত যতই হোক পথ এবং লক্ষ্যস্থল একটি। মহাপুরুষরা যে যুগে ও যে পরিবেশে একথা বলেছিলেন সে যুগ আর সে পরিবেশ আর নেই। এক সময় কম্যুনিস্টরা ছিল কংগ্রেসেরই একটা অংশ। কালক্রমে মত বিরোধ দেখা দিল। কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গেল। উদ্দেশ্য, দেশের স্বাধীনতা ও জনকল্যাণ। স্বাধীনতালাভের পথটা যে কি তা স্থির করতে না পেরে সংঘর্ষে নেমে পড়ল, তারপর স্বাধীনতালাভের পর প্রশ্ন এল জনকল্যাণের। কোন পথে জনকল্যাণ আসবে চিন্তা করতে করতে সবার মনে জাগল ক্ষমতা-লাভের স্পৃহা।

বোধহয় তাই।

সত্যিই তাই। তাও তারা সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না, কারণ,

পথের নির্দেশ তারা খুঁজে পায়নি। প্রথম দুভাগ হল। একদল আদি ও অকৃত্রিম কম্যুনিস্টপার্টি, আরেকদল সাইনবোর্ডের পেছনে লিখে দিল মার্কসবাদী। তাতেও সংঘর্ষ দেখা দিল। যারা কট্টর তারা বলল বিপ্লব চাই। বিপ্লব তখন অনেক দূরে। তরুণগোষ্ঠীর একঅংশ ক্ষিপ্ত হয়ে হাতিয়ার তুলে নিল হাতে, শুরু হল ভেতরে বাইরে লড়াই। আবার গড়ে উঠল আরেকটি দল। তারা সাইনবোর্ডের পেছনে আরেকটি শব্দ জুড়ে দিয়ে এল প্রকাশ্য ময়দানে। মার্কসবাদীর সঙ্গে যুক্ত হল লেনিনবাদী। এখন চলছে জনকল্যাণের জন্য দল উপদলের লড়াই।

হেসে বললাম, অধ্যাপকমোশায়কে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য আলোচনা চলুক।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল নির্ঝরশীতল।

কাজের লোকটাকে বললাম দু কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দরজা ঠেলে ঢুকল পাড়ার সুপরিচিত কমরেড ডাবলু চক্রবর্তী। সঙ্গে সেই যাত্রাদলের পারিষদের মত আবুতালেব। পাড়ায় দুজনেই সুপরিচিত। সোজা ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে বলল, ভাল হয়েছে। শীতলদাও আছেন। একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

নির্ঝরশীতল মুখ তুলে বলল, ব্যাখ্যা? এই অবেলায়, তা আর সম্ভব নয়।

ডাবলু বলল, না বললে শুনছি না। আপনাদের দুজনকেই এর সমাধান করে দিতে হবে। বলরে আবু। বুঝিয়ে বল।

আবুতালেব বলল, ঘটনাটা হল আজ নিধুর চায়ের দোকানে জোর ঝগড়া। কেউ বলছে রাজীব সাচ্চা, কেউ বলছে প্রভাকরণ সাচ্চা।

ডাবলু বলল, আপনারা বিচার করে বলুন কে ঠিক কাজ করছে।

বললাম, দু'জনেই।

মানে?

তোমাদের মনে আছে কি? কয়েক বছর আগে বন্দরনায়েকে যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন শ্রীলঙ্কার মার্কসবাদী কোন দল লড়াইতে নেমেছিল!

মনে আছে।

সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কাকে নৌবাহিনী দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। ভারতীয় সেনারা শ্রীলঙ্কা রক্ষার, মানে মার্কসবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে

শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল। মার্কসবাদীদের নেতা বিজয় বীরসহ আট হাজার মার্কসীয় দলের সদস্যকে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল এই নিষ্ঠুরতার। মার্কিন সরকার বিশ্বব্যাপী যে গুপ্তচরের জাল বিস্তার করে রেখেছে তাদের অর্থপুষ্ট শ্রীলঙ্কার বন্দেরনায়েকে ও ইন্দিরা গান্ধী এই কুৎসিত কাজটি করেছিলেন।

অযথা নরহত্যা! অনুচিত কার্য!

তাই মনে হয় কিন্তু এই দানবীয় কাজ অযথাও ঘটেনি, অনুচিতও নয়। আমেরিকা আতঙ্কিত হয়েছিল, যদি মার্কসীয় চিন্তাধারা শ্রীলঙ্কায় প্রাধান্যলাভ করে তা হলে ভারত মহাসাগর মার্কিনদের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠবে। সেই কারণেই আমেরিকা মদৎ জুগিয়েছিল।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী-ই কেন এই কাজে হাত দিয়েছিলেন?

ব্যক্তিগতভাবে ইন্দিরা ছিলেন ঘোরতর কম্যুনিস্ট বিরোধী। প্রথম যেবার কেরলে কম্যুনিস্ট সরকার গঠিত হয় তখন ইন্দিরা ছিলেন কংগ্রেসের চেয়ারপারসন আর তস্য পিতা ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দাবার ছক এমনভাবে সাজিয়েছিলেন ইন্দিরা নেহেরু গান্ধী, যার পরিণামে কেরল থেকে কম্যুনিস্ট সরকারকে জওহরলাল হটিয়ে দিতে বাধ্য হল। যদি শ্রীলঙ্কায় কম্যুনিস্ট প্রাধান্য স্থাপিত হয় তার ঢেউ ভারতে এসে পৌছবে, এই আশঙ্কায় অঙ্কুরে বিষবৃক্ষ ছেদনে উৎসাহিত হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

কিন্তু এবার তো কম্যুনিস্টদের প্রশ্ন নেই।

আছে। যদিও তামিলরা স্বাধিকার অর্জনের লড়াইতে নেমেছে এবং তাদের দাবী কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচার করার দায়িত্ব শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের। বিষয়টা শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ ঘটনা যার মোকাবিলা করবে শ্রীলঙ্কা সরকার। এতে শান্তিবাহিনী পাঠানোর নামে সশস্ত্র অভিযান কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাজীব যে যুক্তিতে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছেন তা মোটেই সফল যুক্তি নয়। তাই প্রভাকরণের দাবীকে সাচ্চা বললে খুব ভুল হবে মনে হয়না। আবার তামিল ও শ্রীলঙ্কা সরকার যেভাবে রক্তক্ষয়ে নেমেছে তাতে ভারত নির্বিকার থাকতেও পারেনা। দলে দলে তামিল হাজির হচ্ছে ভারতে। তামিলরা আদিতে ছিল ভারতের অধিবাসী, তাদের রক্ষা করতে রাজীব যদি সৈন্য পাঠান তাতে রাজীবের দোষের কিছু নেই!

নিঝ´রণীভজ বলল, এই কারণেই আপনি বুঝি বললেন, উভয়েই সাচ্চা!